মিস মায়া বোর্ডিং-হাউস্

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কাত্যায়নী বুক ষ্টল

২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ
কাত্যায়নী বুক স্টল
২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা

১৩৪৮

প্রিণ্টার—শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়।
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিক

সোদর-প্রতিম

শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ও তদীয় পত্নী

কল্যাণীয়া শ্রীমতী স্নেহলতা দাসীকে

প্রীতি ও আশীর্ব্বাদের সহিত দিলাম।

আর্ট প্রেসের সহৃদয় স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ. মহাশয় এই পুস্তকের ছবিগুলির ব্লক দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

—প্রকাশক

MISS MAYA BOARDING HOUSE.

By,

Mr. Ashamanjee Mukarjee.

চাকুরীর অন্ধকার-পথে অবিশ্রাম ঘুরিয়া, দুই বন্ধু যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন উভয়ের সমস্ত অন্তর নৈরাশ্য ও বিরক্তিতে একেবারে ভরিয়া উঠিল।

দ্বিজেন বলিল, "কি করা যায়, পরিতোষ ?"

পরিতোষ কহিল, "সেই কথাই ত ভাবছি। রেঞ্জার্সে'র টীকেটও ত অনবরতই কেনা হ'চ্ছে, কিন্তু একবারও ত ছোট-খাট একটা প্রাইজও ভাগ্যে জুটল না। আচ্ছা পাথর-চাপা কপাল বটে !"

দ্বিজেন তাকিয়ার উপর আড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—পাথর-চাপাই বটে ! দুঃখের ভীষণ ভারী পাথর। যারা বলে, জগৎটা সুখের, তারা, হয় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, নয় ত—বেজায় ফাঁকিবাজ ; অথবা ভাগ্যগুণে তারা রূপার ঝিনুক-বাটি সঙ্গে নিয়েই জন্ম লাভ করেছে। কিন্তু—কিন্তু—ওঃ… !

পরিতোষ দেহখানি চোদ্দ-পোয়া প্রসারিত করিয়া শুইয়া-পড়িয়া ভাবিল,—পুরুষকার কথাটার কোনই

মানে হয় না দেখচি ; এতদিন পরে ভাগ্যটাকেই মানতে হল। তা না হয় মানলুম, কিন্তু—কিন্তু—আঃ··· !

দু'জনেরই চিন্তা, 'কিন্তু'র সূত্র ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইল। তার পর দু'জনেই খেই হারাইয়া একটা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া যেন পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিল।

সচেতন হইয়া দ্বিজেন বলিল, "চা।"—পরিতোষও একটু গা-নাড়া দিয়া বলিল, "ঠিক ! চা।"

চা আসিলে, কয়েকটি তৃপ্তির চুমুকে চায়ের পেয়ালা খালি করিয়া দ্বিজেন বলিল, "একটা-কিছু ব্যবসা-ট্যাবসাই খুলতে হবে, পরিতোষ। চাকরীর আশা একেবারেই দুরাশা।"

"কিসের ব্যবসা খুলতে চাস্ ?"

"ভেবে-চিন্তে যা-হোক একটা-কিছু খোলা যাক আয়।"

তখন উভয়ের মগজে অনেক রকম ব্যবসায়ের ফন্দী উদয় হইল ; যথা —ডায়িং-ক্লিনিং, হেয়ার-কাটিং সেলুন, বেকারী, দুধ, মাছ, ষ্টেসনারী, মুদীখানা, খাঁটি গব্যঘৃত, বিশুদ্ধ চন্দৌসী আটা, টয়লেট প্রিপারেসন—ইত্যাদি ; —কিন্তু শেষ পর্যান্ত কোনোটাই টিঁকিল না। একটা-না-একটা খুঁত, একটা-না-একটা অসুবিধা, উক্ত প্রত্যেকটি ব্যবসায় হইতে মস্ত লম্বা হাত বাড়াইয়া, যেন উভয়কে

ঠেলিয়া দিল। মীমাংসা কিছুই হইল না। সুতরাং সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া দ্বিজেন উঠিয়া পড়িল ও তাহার পাঁচ-টাকায়-দু'বেলা-পড়াবার টিউসনিতে চলিয়া গেল। পরিতোষেরই বাড়ী; বিশেষতঃ বন্ধুর মত টিউসনির সৌভাগ্যও তাহার ঘটে নাই। সুতরাং সে আসন্ন সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বাহিরের ঘরখানার মেজে-জোড়া সতরঞ্চির উপর তেমনি চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিল; তাহার পর কাৎ হইল, এবং সবশেষে উপুড় হইয়া কিছুক্ষণ থাকিবার পর, দুই হাতে রগ টিপিয়া উঠিয়া বসিল, এবং 'য়্যাসপিরিণ ট্যাবলেট' খাইবার অভিপ্রায়ে মন্থর গতিতে, হেলিতে দুলিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর, পূরা তিন ঘণ্টাকাল শয্যায় শুইয়া চিন্তার পাথারে ভাসিবার—অর্থাৎ ভাবিবার পর, দ্বিজেন সহসা লাফাইয়া উঠিল।

কিসের একটা ব্যবসায় খোলা যায়—সেই চিন্তাই তাহার মস্তিষ্কে আলোড়িত হইতেছিল, এবং পূর্ব্ব-দিনের মত অনেক-কিছু বিষয়ের গবেষণার পর, সে 'বোর্ডিং-হাউসে'র ভিতর আলোকোজ্জ্বল পথ মুক্ত দেখিতে পাইল। বোর্ডিং-হাউসে'র মত সুবিধা আর অন্য কিছুতেই নাই। একবার বাজারে গিয়া জিনিষ-পত্রগুলি কিনিয়া আনা ছাড়া

আর বিশেষ খাটুনি নাই। ভদ্রলোক লইয়া কারবার, বাকী পড়িবার ভয় নাই; ভাঙ্গিবার-চুরিবার বা পচিবার-গলিবারও কিছু নাই। ঝঞ্ঝাটও খুব কম; খালি ভাঁড়ারের প্রতি লক্ষ্য রাখা, আর মাসান্তে বোর্ডারদের তাগিদ দিয়া পাওনা টাকাগুলি 'কলেক্স্যন্' করা। যদি পঁচিশজন বোর্ডার রাখা যায়, আর বোর্ডার-পিছু চারিটা করিয়া টাকা মুনফা থাকিয়া যায়, তাহা হইলেই মাসে টন্-টনে একটি-শো টাকা! তার ঝড়তি-পড়তি নাই। বোর্ডারের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইলে, তখন অন্যত্র আরও একটা বোর্ডিং খুলিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। একটাতে সে নিজে থাকিবে, অপরটির ভার থাকিবে,—পরিতোষের উপর। চমৎকার হইবে।

সুতরাং দ্বিজেন হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে ছুটিল—পরিতোষের কাছে। পরিতোষ রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সব কথা শুনিয়া মহা উৎসাহে দ্বিজেনের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "সব চেয়ে ভাল মৎলব আবিষ্কার করেছ। নাইস্! কিন্তু একটা-কিছু নতুন ব্যাপার করতে হবে—যাতে সকলে 'য়্যাট্রাক্‌টেড্' অর্থাৎ কি না লুব্ধ এবং মুগ্ধ হয়।"

"কথাটা 'রিজ্‌নেবল' বটে; তা সে জন্যে কি করতে চাস্?"

খানিক চিন্তার পর পরিতোষ কহিল, "একটি ইয়ে—

গুড্-লুকিং এবং সুরসিকা তরুণীকে রাখতে হবে—'লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট' হিসেবে। তিনিই বোর্ডারদের খাবার-দাবারের তদারক করবেন। 'টু বিগিন উইথ'—আপাততঃ তাঁকে মাসে গোটা-পঁচিশ করে টাকা দিলেই চলবে; আর বোর্ডিংয়েই থাকবেন তিনি, এবং খাবেনও। অর্থাৎ ঐটিই হবে মাছের চার; তারপর বঁড়সীতে গাঁথো, আর খেলিয়ে তোল!—কি বল্?"

"মতলবটা মন্দ নয়। বোর্ডাররা তা হলে বেশ ভাল ভাবেই জমে যাবে; আর ছাড়তেও চাইবে না। যুগ হিসেবে ব্যবস্থা করতে হবে; যে যুগে যা। নাইস্ মৎলব! এক্সেলেণ্ট!"

সুতরাং পরামর্শ পাকা হইয়া গেল; এবং ইহাও স্থির হইল যে, যে-তরুণীটিকে রাখা হইবে, তাহারই নামে 'বোর্ডিং-হাউসে'র নামকরণ হইবে; যেহেতু ঐ নামটাই হবে—প্রাথমিক আকর্ষণ।

পরিতোষ কহিল, "কিন্তু ঐ রকম একটি ভাল স্ত্রীলোক পাওয়াই মুস্কিল হবে।"

দ্বিজেন কহিল, "ভাল স্ত্রীলোক মানে? দেখতে শুনতে ভাল?"

"সে কথা ত প্রথমেই বলেছি। দেখতে শুনতেও সুশ্রী হয়, চালাক-চতুরও হয় এবং গেরস্থ ঘরের—"

"গেরস্থ ঘরের পাবি কোত্থেকে ? গেরস্থ ঘরের মেয়ে কখনো—। অর্থাৎ 'আউট-ডোর' গেরস্থ হবে আর কি ! তবে আজকাল নামের শেষে একটা দেবী, কি কোন একটা পদবী, এবং গোড়ার দিকে একটা 'মিস্' জোড়া থাকলেই, গেরস্ত ঘরের মেয়েই বোঝাবে ; বুঝলি না ?"

বেশ পরিষ্কার এবং পবিত্রভাবে পরিতোষ বুঝিয়া লইতে পারিল না। মনে একটুখানি খুঁৎ রাখিয়া বুঝিল ; তেমন উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া কহিল, "বুঝেছি।"

পরদিন হইতেই বোর্ডিং খুলিবার আয়োজনাদি সুরু হইল। স্থির হইল—পাঁচশো টাকা মূলধন লইয়া কাজে নামা যাইবে। আড়াইশো দিবে—পরিতোষ, আড়াইশো দিবে—দ্বিজেন।

দিন পাঁচ-সাতেকের মধ্যেই মাসিক একশত টাকা ভাড়ায় একটি দ্বিতল বাড়ী বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইল। উপরে চারিখানি, নীচে চারিখানি, মোট আট খানি শয়ন ঘর। তা ছাড়া স্বতন্ত্র রান্নাঘর, ভাঁড়ার। নীচের প্রশস্ত বারান্দার দুইপাশে কাঠের পার্টিসান দ্বারা ঘিরিয়া দুইটি পৃথক ঘর বানানো হইল। তাহার একটি আফিস, অপরটি লেডী-সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের কোয়ার্টার রূপে ব্যবহৃত হইবে। অতঃপর দৈনিক কাগজে এক জন লেডী-সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইল।

যেদিন প্রাতঃকালে বিজ্ঞাপন বাহির হইল, সেই দিনই দ্বিপ্রহরে এক জন কর্ম্মপ্রার্থিনী আসিলেন।

দ্বিজেন কহিল, "আপনার নাম ?"

"লাবণ্যলতা দাসী।"

পরিতোষ মনে মনে ভাবিল—বড্ড সেকেলে নাম! তা ছাড়া, লাবণ্যলতার চেহারায় আসল বস্তুটিরই—অর্থাৎ লাবণ্যেরই অভাব! সেইজন্য পরিতোষ বিশেষ কোন উৎসাহ না দেখাইয়া, জানালার বাহিরে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আকাশ দেখিতে লাগিল।

দ্বিজেন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পড়া-শুনা কত দূর ?"

"ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলুম। পরীক্ষার আগে আমার ভয়ানক—"

বাকী কথা শেষ করিতে না দিয়াই, দ্বিজেন জিজ্ঞাসা করিল, "বিজ্ঞাপনে দেখেছেন বোধ হয়, 'হোল্ টাইম্' এখানে থাকতে হবে ; তাতে আপনি রাজী আছেন ত ?"

কিন্তু লাবণ্যলতা তাহাতে রাজী নহেন। রাত্রিতে তিনি কিছুতেই থাকিতে পারিবেন না। কহিলেন, "তাতে কাজের কোন ক্ষতি হবে না। সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত আমি থাকবো, এবং দেখা-শুনা করব। আমাকে না-হয় পাঁচ টাকা মাইনে কমই দেবেন।"

পরিতোষ আকাশ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া খবরের কাগজের পাতায় নিবদ্ধ করিল।

লাবণ্যলতা দ্বিজেনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি বলেন আপনি ?"

দ্বিজেন ঘাড় নাড়িল। তা হয় না। দিনরাত এই-খানেই থাকিতে হইবে।—সুতরাং লাবণ্যলতাকে হতাশ হইয়া প্রস্থান করিতে হইল।

পরিতোষ তখন নড়িয়া উঠিল এবং খবরের কাগজ হইতে তাহার একাগ্র দৃষ্টি দ্বিজেনের মুখে ফেলিয়া কহিল, "লাবণ্য নামের পর আর কথা কইবার কোন দরকারই ছিল না। ওই পচা নামের সঙ্গে বোর্ডিংয়ের নাম রাখতে হবে নাকি ? আর তা ছাড়া, চেহারাতে ক'খানা হাড় ভিন্ন আর কিছুই নেই ! লাবণ্যলতার বদলে বরং হাড়-শোভনা বা অস্থিমালিনী নামই ওঁর চেহারার সঙ্গে ঠিক খাপ খায়।"

সন্ধ্যার সময় দুই বন্ধু যখন চা খাইতেছে, সেই সময় 'নমস্কার' বলিয়া আর একটি মহিলা হাসি-হাসি মুখে প্রবেশ করিলেন। পরিতোষ তাঁহার আপাদ-মস্তক একবার অপাঙ্গে দেখিয়া লইয়া, বোধ হয় মনে-মনে খুসী হইল। দেখিতে পরিপাটী। বন্ধুদ্বয়ের চা পানে একটু ব্যাঘাত ঘটিল। যিনি আসিলেন, তিনি কহিলেন, "চা জুড়িয়ে যাবে, আপনারা আগে ওটা শেষ করে নিন্।"

পরিতোষ মনে মনে কহিল, "বেশ ফরওয়ার্ড বটে।"

দ্বিজেন কিছু একটা বলিতে যাইবার মতলবে তাড়াতাড়ি চায়ের ঢোঁক গিলিতে গিয়া বেজায় বিষম খাইতে সুরু করিল। তখন পরিতোষই কহিল, "আপনি এর আগে কি করতেন?"

বুকের কাপড়টার সঙ্গে ব্রুচটা ভাল করিয়া আঁটিতে আঁটিতে নবাগতা কহিলেন, "বিনোদিনী গার্লস্-স্কুলে মিষ্ট্রেস্ ছিলুম।"

"ছাড়লেন কেন?"

"ছাড়লুম—অসুখের জন্য। গরু তাড়ানো কাজ, অর্থাৎ রাখালীটা স্বাস্থ্যে ঠিক সুট্ করল না। বুকের একটু-একটু প্যাল্পিটেসান্ আরম্ভ হল,—তাই ওটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলুম।"

"আপনারা কজন মিষ্ট্রেস্ ছিলেন ওখানে?"

"চার জন মিষ্ট্রেস্ আর তিন জন মাষ্টার।"

দ্বিজেন কহিল, "আচ্ছা আপনার নাম আর য়্যাড্রেস্‌টা দিয়ে যান; যা হয়—খবর দেবো।"

স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেলে, দ্বিজেন পরিতোষের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি রকম মনে হয়?"

"মোটেই সুবিধের নয়। ঐ হার্টের প্যাল্পিটেসানের কথা যা বল্লে, এখানে এলে ওটা আরও বেড়ে যাবে।

তখন ওঁর ঝক্কি সইতে গিয়ে, আমাদেরই প্যাল্পিটেসান রোগ দাঁড়িয়ে যাবে !”

সুতরাং ইনিও না-মঞ্জুর হইলেন।

পরদিন সকালে শ্রীমতী গীতা, সীতা, কানন, কাজল, গীতিকা, সেবিকা, তটিনী, মানসী প্রভৃতি ডজন-খানেক যুবতী একে-একে কর্ম্মপ্রার্থিনীরূপে আসিয়া দর্শনদান করিলেন; কিন্তু সকলকে পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া সগৌরবে জয়পতাকা লাভ করিলেন—মিস্ মায়া গুপ্তা। বয়স—বছর চব্বিশ, গড়ন সুডৌল, মেজাজ প্রফুল্ল, স্বাস্থ্য —নিখুঁত। তাঁহার কথা-বার্ত্তার মধ্যে বেশ-একটা সরস মাধুর্য্য এবং আকর্ষণ আছে। সুতরাং তিনিই বাহাল হইলেন, এবং তাঁহারই নামে বোর্ডিংয়ের সুরঞ্জিত ও সুদৃশ্য সাইনবোর্ড ঝুলিল—

স, মায়া বোর্ডিং-হাউস।

২

সংবাদ-পত্রে ‘মিস্ মায়া বোর্ডিং’এর বিজ্ঞাপন বাহির হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি এ দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল, এবং ইহার ২৫টি সীট দেখিতে-দেখিতে পূর্ণ হইয়া গেল।

দ্বিজেন এবং পরিতোষ, মিস্ মায়ার সাহায্যে ও সহযোগিতায় পরমানন্দে এবং চরমোৎসাহে বোর্ডিংয়ের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিয়া যাইতে লাগিল।

একমাস উত্তীর্ণ হইলে, বোর্ডারদের নিকট হইতে টাকা আদায় হইল। দ্বিজেনের কল্পনার হিসাব সত্যে পরিণত হইল। সমস্ত ব্যয় বাদে বোর্ডার পিছু চারি টাকা হিসাবে মোট এক শত টাকা মুনাফা পাওয়া গেল।

কিন্তু ব্যবসায়ের এই প্রথম সাফল্যই দ্বিজেনকে কথঞ্চিৎ চিন্তাকুল করিয়া তুলিল। দ্বিজেন ভাবিতে লাগিল, "পরিতোষকে না নিলেই হ'ত। ওর আড়াইশোটা টাকার জন্যে মাসে মাসে ওকে লাভের আর্দ্ধেক দিয়ে যেতে হবে। বড্ড বোকামীর কাজ করিচি।"

প্রথম মাসের লাভের পঞ্চাশটা টাকা হাতে পাইয়াই পরিতোষ স্ত্রীর জন্য দুখানা ভাল শাড়ী, সাবান, সেণ্ট প্রভৃতি এবং নিজের জন্য গোটাকতক আদ্দির পাঞ্জাবী, একটা ভাল ফাউণ্টেন পেন, দুইখানা উৎকৃষ্ট তোয়ালে এবং টুথ-পেষ্ট, ক্ষুরের ব্লেড, শেভিং-ষ্টিক, য়্যাস্পিরিণ ট্যাবলেটের ফাইল প্রভৃতি কিনিয়া ফেলিল। আর দুই বেলার জায়গায় প্রত্যহ তিনবেলা করিয়া আরামে আনন্দে চা পান করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

কিন্তু দ্বিজেন হঠাৎ একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে সে সর্ব্বদাই গুন্‌গুন্ করিয়া যে গান গাহিত, তাহার সেই গুন্‌গুনাণি বন্ধ হইয়া গেল। দ্বিজেনের এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া পরিতোষ কহিল, "তোর হোল কি হঠাৎ? পকেট খালি থাকতে তোর মুখে হাসি ছিল, এখন পকেট-ভারির সঙ্গে-সঙ্গে মুখের হাসিও পকেট-জাত্ ক'রে বসলি নাকি?"—প্রত্যুত্তরে শুধু একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া, দ্বিজেন বিনা-আবশ্যকেই রান্না-ভাঁড়ারের তদ্বিরাদির জন্য চলিয়া গেল।

রাত্রে শুইয়া পূর্ব্বের মতই দ্বিজেনের অনেক রাত অবধি ঘুম আসে না। পূর্ব্বে অনিদ্রার কারণ ছিল—চাকুরীর অভাব, পয়সা কড়ির অনটন; এখনকার কারণ হইতেছে, বোর্ডিং-হাউসের সপত্নীতুল্য অংশীদার—পরিতোষ।

সে-দিন অপরাহ্নে বোর্ডিং-হাউসের আফিস ঘরে বসিয়া পরিতোষ একাগ্রমনে যুদ্ধের সংবাদ পড়িতেছিল, আর দ্বিজেন যেন আহত সৈনিকের ন্যায় চিন্তা-রণাঙ্গণে শয়ান থাকিয়া নীরব-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। গভীর চিন্তার ফলে তাহার মস্তিষ্ক যেন একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; স্নায়ু-মণ্ডলীতে যেন একটু অবসাদ আসিল। দ্বিজেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। মিনিট পাঁচেক পরে সেই তন্দ্রাবস্থাতেই উচ্চকণ্ঠে

সে হুঙ্কার দিল—"ওকে ভাগাতেই হবে!" সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার তন্দ্রা-ঘোর কাটিয়া গেল; সে উঠিয়া বসিল। পরিতোষ কাগজখানা রাখিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "কি রে, ব্যাপার কি? একটা আমড়ার আঁটি দেখছি ঘোড়ার ল্যাজের লোমে বেঁধে তোর গলায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। কা'কে ভাগাবি?"

একটু অপ্রতিভ হইয়া, একটু ঢোঁক গিলিয়া, দ্বিজেন কহিল, "ঐ মায়া গুপ্তটাকে।"

পরিতোষ কাপড়ের খুঁটে তাহার চশমার কাচ মুছিতে মুছিতে কহিল, "কি ব্যাপার বল্ ত। এই নিয়ে খুব ভাবিস্ দেখছি, নইলে স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠিস!—তা, দেখে-শুনে য়্যাপয়েণ্ট্ করলি, এরই মধ্যে ভাগাতে চাস্ কেন?"

কয়েক সেকেণ্ড একটু ভাবিয়া লইয়া দ্বিজেন কহিল, "ভারী ভুল হয়ে গিয়েচে। ওর নামে বোর্ডিংএর নাম রাখলুম, কিন্তু কোন কারণে যদি ভবিষ্যতে ও চলে যায় তা হ'লে ত—"

বাধা দিয়া পরিতোষ কহিল, "সে অসুবিধে যদি ঘটে, তাহ'লে ভবিষ্যতে ঘটবে; কিন্তু এখনই ওকে ভাগিয়ে, বর্ত্তমানেই সে অসুবিধে টেনে আনবার মত বুদ্ধি তোর আসছে কেন, বুঝতে পাচ্চি নে! 'ব্যাচিলার' হয়ে

আছিস, আর কা'রো সঙ্গে প্রেমে-ট্রেমে পড়লি নাকি, এটাকে ভাগিয়ে তাই তাকে আনতে চাস ?

কথাটা দ্বিজেন মানাইয়া লইতে অপারগ হওয়ায় মনে-মনে একটু লজ্জিত হইল।

পরিতোষ কহিল, "তা ছাড়া, ভবিষ্যতেও ত কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। এ যদি চলেই যায় কখনো, তাহ'লে এর জায়গায় যে-ই আসবে, এখানে তারই নাম হয়ে যাবে—'মিস্ মায়া'। আর তা না হলেও ক্ষতি নেই। মিস্ মায়া বলে কা'কেও যে এখানে সশরীরে থাকতে হবে, তারও কোন মানে নেই।"

দ্বিজেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "থাম্ থাম্, অত লেক্‌চারিফাই করতে হবে না ; কাঁধের উপর মাথা একটা আছে, সুতরাং বুঝতে পেরেছি।"

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দ্বিজেন শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, "একটু ব্যবস্থা ক'রে চালালে, বোর্ডিং থেকে মাসে ১২৫টা ক'রে টাকা সহজেই আয় ক'রতে পারা যায়। তার মানে—বছরে দেড় হাজার। দশ বছরে পনর হাজার। কিন্তু তা ত আর হবে না, ঐ ল্যাং-বোটটাকে নিয়েই যে সব মাটি করলুম !"

পরদিন দ্বিজেনকে বেশ-একটু প্রফুল্ল এবং স্ফুর্তিযুক্ত দেখা গেল। রাত্রির রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া

বৈকালের দিকে সে বোর্ডিং হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বরাবর 'দৈনিক দেশবন্ধু' কাগজের অফিসে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া, পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া, বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজারকে কহিল,"কালকের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা ছাপা হবে, কত খরচ পড়বে ?"

ম্যানেজার বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া হিসাব করিয়া যাহা বলিল, দ্বিজেন পকেট হইতে সেই টাকা বাহির করিয়া দিল, এবং রসিদ লইয়া চলিয়া আসিল।

পথে আসিতে আসিতে সে একটা ছাপাখানায় প্রবেশ করিল ; কহিল, "পাঁচখানা চিঠির কাগজের হেডিং ছাপিয়ে দিতে হবে।"

প্রেসের বাবু একটু বিস্মিত ভাবে কহিল, "মোটে পাঁচখানা ?"

"আপাততঃ তাই ; অর্থাৎ নমুনার মত আর কি। তারপর পছন্দ হ'লে পাঁচ হাজার।"

"কিন্তু ছাপার চার্জ্জ, পাঁচশোয় যা' পড়বে, পাঁচখানাতেও তাই পড়বে।"

"পড়ুক।"

তখন দর-দাম ঠিক হইল, এবং কিছু বায়না দিয়া

দ্বিজেন বোর্ডিংয়ে ফিরিবার উদ্দেশে 'বাসে' উঠিল ; কয় দিন পরে আজ সে গুন্-গুন্ করিয়া গান ধরিল,—

'অতিথি আমি তোমারি দ্বারে
এসেছি, আজি—এসেছি।'

৩

পরদিন সকাল বেলা যখন দোতলার বারান্দায় হেমবাবু, গজেনবাবু, নুটুবাবু প্রভৃতি দোতলার বোর্ডাররা, মিস্ মায়াকে লইয়া নানারূপ গল্প-গাছা করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে সকলের মিলিত কল-হাস্য বোর্ডিং-বাড়ীর স্থির বায়ুতে তরঙ্গ তুলিতেছিল, তখন নীচের অফিস-ঘরে দুই বন্ধুতে কোন বিষয়ে পরামর্শ চলিতেছিল।

পরিতোষের হাতে 'দৈনিক দেশবন্ধু' পত্রিকার কর্ম্ম-খালির পাতাটা খোলা ছিল। দ্বিজেন কহিল, "সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। ছেড়ে দে একটা দরখাস্ত। লাগে লাগবে, না লাগে—না লাগবে।"

কাগজে কর্ম্মখালির একটা বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। এক জন টাইপ-জানা, আই-এস-সি বাঙ্গালী য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট চাই। বেতন বর্ত্তমানে ৭৫৲—পরে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০৲ হইবে। প্রঃ ফঃ-য়ের ব্যবস্থা আছে। কর্ম্মস্থল—বোম্বাই সিমসন্ ট্রটসকাই, ভিক্টোরিয়া হোটেল।

দ্বিজেন বলিল, "তুই আই-এস্-সি আছিস, টাইপও জানিস, আর বাঙালী ত বটেই ; সুতরাং দরখাস্ত একখানা ছাড়তে দোষ কি ?"

"ছাড়বো ?"

"ক্ষতি কি ? চারটে পয়সার ব্যাপার ত।"

আরও কিছু আলোচনা-পরামর্শের পর পরিতোষ তখনি একখানা দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিয়া, ডাকে দিবার অভিপ্রায়ে, সেখানি পকেটে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন চেয়ারের দুই হাতলের উপর ভর দিয়া দ্বিজেন যেন তিড়িং করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; সঙ্গে-সঙ্গে তাহার কণ্ঠ হইতে চাপা-সুরে কালকের সেই গানখানা গুঞ্জরিয়া উঠিল,—

'অতিথি আমি তোমারি দ্বারে'—ইত্যাদি।

লেটার-বক্সের চাবিটা মিস্ মায়ার কাছে থাকিত। দ্বিজেন তাহা চাহিয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিল।

দিন-আষ্টেক পরে বাক্স খুলিতেই দ্বিজেন পরিতোষের নামে বোম্বে 'ডেড-লেটার অফিসে'র ফেরত একখানা কভার পাইল। কভারখানা সে খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর সবশুদ্ধ সেখানা টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া, নিজেই গিয়া রাস্তার ধারে 'ডাষ্ট-বীনে' ফেলিয়া দিয়া আসিল।

ইহার পর আরও চার-পাঁচ দিন পরে একদিন সকালে

পরিতোষ বোর্ডিংয়ে আসিলেই দ্বিজেন লাফাইয়া উঠিয়া সহাস্যে বলিল, "পেট ভ'রে খাইয়ে দিয়ে তবে যাওয়ার কথা বাবা!"

পরিতোষ সু-খবরের যেন একটু আমেজ পাইল; কিন্তু ততটা ভাবিয়া লইতে ভরসাও হয় না। অথচ চাপা আনন্দের গুরুগাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল "ব্যাপারটা কি?"

"ব্যাপার ভল্যাডিভষ্টক্ ক্যামসচট্কাই!—চাকরীর কেল্লা ফতে!" বলিয়া পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দ্বিজেন পরিতোষের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

চিঠিখানা বম্বের মেসার্স সিম্‌সন্ ট্রটস্‌কাই কোম্পানীর অফিস হইতে আসিয়াছে। পরিতোষের দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে; তাহাকে এক সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগদান করিতে লেখা হইয়াছে। চিঠিখানা পাঠ করিয়া পরিতোষের চাপা আনন্দ আরও চাপ খাইল। গাম্ভীর্য্যের সহিত অত্যন্ত সহজ ভাবে পরিতোষ কহিল, "শাঁস ত দিলি, খোসা কোথায়? চিঠির কভারটা?"

দ্বিজেন তাহার পকেট-কয়টা এবং টেবিলের উপরকার কাগজ-পত্র বারংবার খুঁজিল; কিন্তু পাওয়া গেল না।

অতঃপর দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ হইল।

আনন্দ শুধু পরিতোষের একার হইল না, দ্বিজেনেরও হইল। দ্বিজেন কহিল, "তোর আমার দেহ ভিন্ন বটে কিন্তু প্রাণ এক ; তোর ভালো হ'লে আমারও ভালো।"

পরিতোষ কহিল, "কিন্তু বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থাটা ?

দ্বিজেন একটু যেন হতাশ হইয়া কহিল, "বোর্ডিং বরাবর ভালভাবে চলবে না। আমি খুব ভালো ক'রে ভেবে-চিন্তে দেখলুম—এতে নামাটাই আমাদের ভুল হ'য়েছে।"

"কেন ?"

"সে অনেক ব্যাপার ; জটিল সমস্যা ! সব ব'লবো এক সময়।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া দ্বিজেন পুনরায় কহিল "একশো টাকা ত 'ক্যাশ'-এ আছে, ঐটে তুই নিয়ে যা ; বাকী দেড়শো, আদায়-উস্থুল হ'লে পরে পাঠিয়ে দোবো। কিন্তু ফি-হপ্তায় চিঠি-পত্র দিতে ভুলিস নি।"—তাহার পর আবার একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, "সংসারটা মস্ত-বড় একটা চলবার পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। যত ঘনিষ্ঠতা, যত আলাপই হোক, আসলে তা ক্ষণেকের, অস্থায়ী পথের আলাপ। কে কখন্ ছিটকে প'ড়ে দূরে স'রে যায়, তার কিছুরই ঠিক নেই।"—দ্বিজেন ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মোটের উপর স্থির হইল যে, সেই দিনই রাত্রির 'মেল্'-এ পরিতোষ বম্বে যাত্রা করিবে। বোর্ডিং সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল, তাহার ষোল-আনা দায়িত্ব এখন হইতে দ্বিজেনের। উহার লাভ-লোকসানের জন্য পরিতোষকে আর দায়ী থাকিতে হইবে না। উভয়ের মধ্যে যে অংশী-দারনামা লিখিত হইয়াছিল, সেই দলিলের পিঠে এই প্রস্তাব লিখিয়া পরিতোষ তাহাতে নাম সহি করিয়া দিল। স্বাক্ষিস্বরূপ উহাতে মিস্ মায়ারও একটা স্বাক্ষর থাকিল। তা' ছাড়া, দ্বিজেন মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিল, কালই গিয়া কাগজে এই মর্ম্মে একটা বিজ্ঞপ্তি বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে যে,—'মিস্ মায়া-বোর্ডিং'এ আমাদের দুই জনের যে সংস্রব ছিল, আজ হইতে তাহা'...ইত্যাদি।

বৈকালে দুই বন্ধুর শেষ সাক্ষাৎ এবং বিদায়ালাপ হইল। ট্রেণ সাড়ে সাতটায়। পৌঁছিয়াই চিঠি লিখিবার জন্য দ্বিজেন বার বার বন্ধুকে বলিয়া দিল।

সে-দিন একটু সকাল-সকাল বোর্ডিং হইতে বাসায় ফিরিয়া, খাইয়া লইয়া দ্বিজেন শুইয়া পড়িল; কিন্তু ঘুম আসিল না। এই জিনিসটির রহস্য বুঝিতে পারা শক্ত। দুঃখের দিনে তাহার ঘুম আসিত না, আজ সুখের দিনেও কিন্তু আসিতে চাহিতেছে না। পড়িয়া-পড়িয়া সে ভাবিতে

লাগিল—'রাত এগারোটা; পরিতোষ এতক্ষণে মধুপুরের কাছাকাছি। বোম্বে পৌঁছাবার পরই চোখে দেখবে অন্ধকার; সে-অন্ধকারে ট্রটস্‌কাই কোম্পানীর আফিস খুঁজে বার করতে তার পায়ের নড়া যাবে ছিঁড়ে, আর মাথা যাবে ঘুরে! তার পর ফিরবে। কিন্তু আমার কাজ 'ক্লীয়ার'। কাল থেকে উঠে-প'ড়ে বোর্ডিংয়ের কাজে লাগতে হবে। পাশের ছোট বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে, আর গোটা-দশেক 'সীট' এইবার বাড়িয়ে ফেল্লে হয়। তা হলে মাসে প্রায়···

"দ্বিজু!"

রাস্তার ধারের জানালা হইতে কে ডাকিল,—দ্বিজু!

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দ্বিজেন দেখিল, সামনে দাঁড়াইয়া—পরিতোষ! কহিল,—"এ কি! তুই যাসনি?"

"দেখতেই ত পাচ্ছিস। যাওয়া হ'ল না, এবং হবেও না।"

"কারণ?"

"বিকেলের 'টেলিগ্রাম' পড়েছিস? আবার ভয়ানক একটা রেলওয়ে য়্যাক্‌সিডেন্ট হ'য়েচে। প্যাসেঞ্জার শুদ্ধ পাঁচখানা 'বগী' একবারে ভেঙ্গে চুরমার! পাঁচ-সাত শো লোক একেবারে···। বাবা আর মা কিছুতেই যেতে দিলেন না।"

রাস্তার ধারের রোয়াকটার উপর দ্বিজেন ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল পুঞ্জ-পুঞ্জ শর্ষপ-কুসুম!

৪

দ্বিজেনের নৌকা কূলে লাগিয়াও লাগিল না। পরিতোষকে সে ভাগাইতে পারিল না। তার উপর ঈশান কোণে একখণ্ড গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উদয় হইল।

কি কুক্ষণে যে সে-দিন দো-তালার বোর্ডার—অসুস্থ ন্নুটুবাবুর জন্য মিস্ মায়া নিজহাতে দুধ-বার্লিটা লইয়া গিয়াছিলেন! এই ব্যাপারেই মেঘের সঞ্চার।

সন্ধ্যার সময় মিস্ মায়া নীচের বোর্ডারদের যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-বেলা হাঁসের ডিম আনা হ'য়েচে। কি খাবেন সব বলুন, ডাল্না না ভাজা?"

নীচের বোর্ডারদের মধ্যে কার্ত্তিকবাবু হ'লেন চাঁই। তিনি যেন অতি-মাত্রায় বিনয়ের সহিত বলিলেন, "ন্নুটুবাবু যা ব'লবেন তাই হবে; ওর আর কি!"

"কিন্তু তিনি ত আর খাবেন না; তাঁর ত অসুখ। খাবেন আপনারা। বলুন—কি হবে?"

সুটুবাবুর অসুখের সংবাদে কার্ত্তিকবাবুর মন যেন খারাপ হইয়া গেল; কহিলেন, "যা হয় হোক। ওঁর জ্বরটা আজ কত উঠেছিল? একবার ক'রে রোজ খবরটা আমাদের দেবেন।"

মিস্ মায়া মনে-মনে একটু বিরক্ত হইয়া রান্নাঘরের দিকে ফিরিলেন। এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদরূপে তিনি—আবশ্যক না হইলেও—আরো বেশী করিয়া দোতালায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ফলে, নীচের বোর্ডারদের আর দো-তালার বোর্ডারদের মধ্যে ভিতর-ভিতর একটা অপ্রীতি ও অসন্তোষের ভাব জাগিয়া উঠিতে সুরু করিল। এক দিন আহার করিতে করিতে নীচের এক জন বোর্ডার, ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ডাল জলবৎ পাৎলা ক্যানো হ্যা?"—আর এক জন বলিল, "ক্ষীরবৎ ঘন ডালটা বোধ হয় তোলা আছে। সেটা আমাদের জন্যে নয়।"

কথাটাকে হাল্কা করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মিস্ মায়া হাসিতে-হাসিতে কহিলেন, "আপনাদের আর আলাদা জল খাবার পরিশ্রম করতে হবে না; ভালই ত।"

"কিন্তু মাসে-মাসে টাকাগুলোও আর এই জলে ফেলে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নয়—আমরা মনে করচি।"

সে-দিন এই স্থানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।

পরিতোষ দ্বিজেনকে কহিল, "গতিক ভাল নয়. একটু হুঁসিয়ার !"

দ্বিজেন মিস্ মায়াকে চুপি-চুপি পরামর্শ দিল, "আপনি নীচের এঁদের একটু ভাল ক'রে তদ্বির করবেন, —যাতে এঁরা সন্তুষ্ট থাকেন। এঁদের দেখছি অভিমান একটু বেশী।"

পরদিন প্রাতঃকালে মিস্ মায়া নীচের বোর্ডারদের মজলিসে আসিয়া মোলায়েম হাসির সহিত বলিলেন, "কাল রাত্রে কি ভীষণ গরম গেছে বলুন। শুনলুম নাকি, য়ুরোপের গোলা-গুলী-বোমার ধাক্কায় পৃথিবী ভয়ানক কেঁপে উঠে' সূর্য্যের দিকে অনেকখানি স'রে গিয়েছে।"

হেমন্ত কহিল, "খবরটা ঠিকই। ভীষণ ধাক্কা! দেখুন না, আমাদের বোর্ডিংয়েও ধাক্কাটার একরত্তি জের এসে লেগে আপনাকে হঠাৎ ওপর থেকে নীচে ফেলে দিয়েছে।"

অতঃপর দু-পাঁচটা দেশের কথা, দু-পাঁচটা দশের কথা; কিছু রহস্যালাপ, কিছু হাসা-হাসির মধ্য দিয়া মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল, এবং যে বিষ-বাষ্পটুকু সকলের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হাল্কা হইয়া গেল।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, কোন দ্রব্য হাল্কা হইলেই তাহার ঊর্দ্ধগতি হয়। সুতরাং নীচের সেই বাষ্প আসিয়া জমিল—উপরে।

উপরের বাবুরা নীচের বাবুদের সঙ্গে বাক্যালাপ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন।

এক দিন নুটুবাবু বারান্দার রেলিং হইতে গলা বাড়াইয়া দ্বিজেনের উদ্দেশ্যে কহিলেন, "দেখুন, সবে জ্বর থেকে উঠিচি, রাত্রে একটু ঘুমের দরকার। কিন্তু বড্ড ব্যাঘাত্ হ'চ্চে। রাত দুপুর পর্য্যন্ত 'কচে-বারো' 'ছ-তিন-নয়' ইত্যাদি হরেক রকম চীৎকারের চোটে আমাদের কারুর ত ঘুমোবার জো নেই!"

দ্বিজেন একটু রোখা-গোছের লোক। পরিতোষের মেজাজটা ঠাণ্ডা। তাই দ্বিজেনের পরিবর্ত্তে পরিতোষই নীচের বাবুদের এ সম্বন্ধে মিনতি করিয়া একটু বুঝাইয়া বলিল। কিন্তু ফল হইল বিপরীত! সে-দিন হইতে রাত দুইটা পর্য্যন্ত পাশা চলিতে লাগিল, এবং সময়ের অনুপাতে চীৎকারের মাত্রাও যথেষ্ট রকম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

দো-তালার বাবুরাও সমরে পশ্চাৎপদ হইলেন না। তাঁহারা কোথা হইতে ডজন খানেক ছাদ-পেটা কাঠের মুগুর লইয়া আসিলেন, এবং প্রত্যহ রাত তিনটা পর্য্যন্ত একযোগে দমাদম্ শব্দে ছাদ পিটিতে সুরু করিলেন।

উপর্য্যুপরি রাত্রিজাগরণের ফলে, দো-তালার সিদ্ধেশ্বর, গজেন, হেমবাবু প্রভৃতি কয়েক জন বোর্ডারের গর-হজম হওয়ায় একটু পেট-খারাপ হইল। নুটুবাবু পরিতোষকে ডাকিয়া কহিলেন, "অন্য মাছ-টাছের বদলে আজ একটু কৈ-মাছের ঝোল হ'লেই ভাল হয়।"—নীচের বাবুরা কথাটা জানিতে পারিয়া দ্বিজেনকে কহিল, "আজ যেন টাট্‌কা ইলিস মাছের ঝোল হয়; অন্য কোন মাছ হ'লে আমরা কিন্তু কেউ খাব না।"

মিস্ মায়া কহিলেন, "য়ুরোপের যুদ্ধকেও দেখছি এঁরা হার-মানালেন!"

যাহা হউক, দ্বিজেন দুকূল বজায় রাখিবার জন্য কৈ-মাছের ঝোলেরও ব্যবস্থা করিল, গঙ্গার ইলিস মাছের ঝোলেরও আয়োজন করিল। মাস-কাবার হইয়া পাঁচ-সাত দিন হইয়াছে, আর দু'এক দিনের মধ্যেই সকলের টাকা দিবার কথা; সুতরাং উভয় পক্ষকেই এ সময় সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু খাইতে বসিয়া এ-পক্ষ একেবারে বাঁকিয়া বসিল। তাহারা বলিল, "কৈ-মাছের ঝোল হ'ল কেন, আমরা ভাত খাব না।"

দ্বিজেন বলিল, "কৈ আপনাদের জন্যে নয়; আপনাদের জন্যে টাট্‌কা ইলিসেরই ঝোল হ'য়েছে।"

"তা হোক; কিন্তু কৈ মাছেরও ত ঝোল হয়েচে। হ'ল কেন? আমরা ত ব'লেছিলুম যে ইলিস ছাড়া অন্য কোন মাছ যেন আজ বোর্ডিংয়ে না ঢোকে।"

নীচের ইহারা আজ আগে খাইতে বসিয়াছিল। তাহারা রাগ ও জেদ করিয়া, যত ভাত রান্না হইয়াছিল, সবই খাইয়া ফেলিল। তাহাদের ভাত খাওয়া দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। হাঁড়ীতে আর কাহারো খাইবার মত একটি কণাও ভাত না রাখিয়া তাহারা উঠিয়া গেল। দ্বিজেন ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি চার হাঁড়ী ভাত চাপাইতে বলিল। কিন্তু বেলা তখন সাড়ে নয়টা। তখন ভাত চড়িলে সেই ভাত খাইয়া ঠিক সময়ে আফিসে হাজিরা দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং নুটুবাবু কহিলেন, "সিদ্ধেশ্বর, গজেন, হেমবাবু প্রভৃতির জন্যে চিঁড়ে দইএর ব্যবস্থা ক'রে দিন; আর বাকী সকলের জন্যে বাজার থেকে খাবার আসুক।"

দ্বিজেন কহিল, "কি খাবার?"

"এই লুচি, কচুরি, সিংয়েড়া, সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতুয়া প্রভৃতি। আমাদেরই এরা গিয়ে কিনে আনবে, আপনি গোটা-দশেক টাকা এনে দিন।"

চম্‌কাইয়া উঠিয়া দ্বিজেন কহিলেন, "দ—শ টাকা!"

"তার কমে ১২।১৩ জন লোকের হবে কেন?"

পরিতোষ ইসারা করিয়া দ্বিজেনকে তাহাই দিয়া দিতে বলিল। আড়ালে আসিয়া বলিল, "এ সময় আর কোন গোলমাল ক'রে দরকার নেই।"

দ্বিজেন ভিতর-ভিতর আগুন হইয়া উঠিয়াছিল। ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল, "পাওনা টাকাগুলো আদায় হ'য়ে গেলে, গোলমাল করার মজাখানা দেখিয়ে দিতুম। আমিও দ্বিজেন সেন, বড় সোজা ছেলে নই।"

সিঁড়ির ধারে, দরজার আড়ালে যে নুটুবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, দ্বিজেন তাহা দেখিতে পায় নাই। কথাগুলি নুটুবাবুর কাণে গেল। নুটুবাবু দ্বিজেনের উদ্দেশে কহিলেন,—"আমরা জানতুম, আপনি সোজা ছেলে। তা বেশ, কে কাকে মজা দেখায়, তাই দেখা যাক!"—বলিয়া দুম্ দাম্ শব্দে সিঁড়ি কাঁপাইয়া নুটুবাবু উপরে উঠিয়া গেলেন।

দ্বিজেন আফিস-ঘরে আসিয়া গালে হাত দিয়া বসিল।

মিস্ মায়া পূর্ব্বেই তাঁহার ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন।

পরিতোষ দালানের যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

৫

সেদিন ছিল শনিবার। বাবুরা সকাল-সকাল ফিরিলেন। সেদিনের প্রভাতের সেই চঞ্চল বাতাস, সন্ধ্যার দিকে যেন স্থির বলিয়া মনে হইল। সন্ধ্যার পর কিন্তু একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার লক্ষিত হইল। দেখা গেল, যেন সহসা কোনও যাদুমন্ত্রবলে উভয় দলের মধ্যে 'প্যাকট্' হইয়া গিয়াছে, এবং উপরের ও নীচের বাবুরা ঘন-ঘন সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করিতেছে।

দ্বিজেন মিস্ মায়াকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?"

"কিছুই জানি না; তবে দেখছি, 'পিস্' হয়ে গেল!"

"বাঁচা গেল।"

খানিক পরে উপরের বারান্দা হইতে ষ্টোভের সোঁ সোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। মিস্ মায়া আসিয়া কহিলেন, "তিনটে ষ্টোভ জ্বালিয়ে ফাউল্ রান্না হচ্ছে; আর পঞ্চাশটা ডিম এসেচে—মামলেট হবে।"

দ্বিজেন বুঝিতে পারিল, সকালের সেই দশ টাকার শ্রাদ্ধ হ'য়ে যেটুকু বাকী ছিল, শ্রাদ্ধের সেইটুকু এখন গড়াচ্ছে!

ইহার কিছু পরেই উপরের বারান্দায় সম্মিলিত শক্তির বীরদর্প-পূর্ণ থিয়েটারী বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া গেল,—

'কে কারে দেখিয়া লয়—দেখিব পামর !
গদাঘাতে এক—
উরুভঙ্গ ক'রে দিব ওরে দুর্য্যোধন।'

সমস্বরে এইরূপ গানও চলিল,—

'কে কাকে মজা দেখায় —দেখাই যাক।
ও তোর গলায় দিয়ে গামচা-পাক—
চুবাবো ডোবার জলে—ও ভোলা মন !
ঘাঁটবি সেথায় পচা পাঁক।
মজাটা ভালো ক'রেই দেখা যাক।'

বেগতিক দেখিয়া পরিতোষ সকাল-সকাল গৃহে চলিয়া গেল। বলিয়া গেল যে, কাল বোধ হয় তাকে একবার চন্দননগর যাইতে হইবে। তার মেশোমহাশয়ের অসুখ।

দ্বিজেন মনে করিয়াছিল, গত মাসের বোর্ডিং-ফীটা সকলকে দিয়া দিবার জন্য আজ বলিবে। কারণ, মাসের আজ চৌদ্দ তারিখ; সম্ভবতঃ মাহিনা পাইতে কাহারো আর বাকী নাই। কিন্তু মিস্ মায়া পরামর্শ দিলেন, "আজ থাক দ্বিজেনবাবু; কাল রবিবার ছুটীর দিন আছে; কালকেই বলবেন।"

পরদিন সকালে বোর্ডিংএ আসিয়াই দ্বিজেন সকলের কাছে টাকা চাহিল; কিন্তু কেহই কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য করিল না,—হাঁ-ও বলিল না, না-ও বলিল না। সকলেই এক-যোগে মূক ও বধির সাজিল।

বার বার চাহিয়াও যখন টাকা পাওয়া দূরের কথা, একটা জবাবও কাহারো নিকট হইতে মিলিল না, তখন দ্বিজেন সাংঘাতিক রাগিয়া গেল। উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"আপনাদের সব মৎলব কি, আমি জান্‌তে চাই।"

উপর হইতে নুটুবাবু মুখ বাড়াইয়া তেমনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "আমাদের মৎলব হোচ্চে, কে কাকে মজা দেখায়, সেইটে দেখা। কার্ত্তিকবাবু! মৎলবটা কি একবার শুনিয়ে দিন।"

নীচের ঘর হইতে কার্ত্তিকবাবু, হেমন্ত প্রভৃতি বাহির হইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "টাকা? কিসের টাকা?—এক পয়সাও পাবেন না। এই রকম জঘন্য খাইয়ে টাকা পাওয়া যায় না!"

দ্বিজেনের মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল; কহিল, "জঘন্য খাওয়া?"

"হ্যাঁ—জঘন্য; একশো বার জঘন্য; হাজার বার জঘন্য।"

দ্বিজেন বাড়ী ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "টাকা দেবেন কি না শুনতে চাই ?"

তখন উপরের ও নীচের পঁচিশ জন বোর্ডার সমস্বরে চীৎকার করিয়া জবাব দিল, "দেবো না—আ-আ-আ।"

ক্রোধে দ্বিজেন কাঁপিতে লাগিল। মিস্ মায়া তাহাকে আফিস-ঘরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আফিস ঘরের পরিবর্ত্তে দ্বিজেন ক্রোধে উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে এবং টলিতে টলিতে বোর্ডিং হইতে বাহির হইয়া গেল।

সারাদিন ধরিয়া তিনি চার জন উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দ্বিজেন বেলা প্রায় চারিটার সময় শ্রান্ত দেহে ও অবসন্ন মনে বাসায় ফিরিয়া স্নানাহার করিল। তাহার পর যখন বোর্ডিংয়ে আসিল. তখন অপরাহ্ণ প্রায় ছয়টা।

বোর্ডিংএ আসিয়া দেখিল, বোর্ডিং একেবারে চুপ চাপ; মিস্ মায়া ছাড়া আর কেহই নাই। চার বস্তা চাল উঠানে ও নর্দ্দমায় ঢালা। দালানে এক টীন তেলের স্রোত বহিতেছে, আর থালা, গ্ল্যাস, বাটী প্রভৃতি বাসনগুলি দুম্‌ড়াইয়া—ভাঙ্গিয়া বাড়ীর সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত!

দ্বিজেন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যাপার ?"

মিস্ মায়া বলিলেন, "সব চ'লে গেছে।"

"কখন ?"

"ঘণ্টাখানেক আগে।"

"কি ব'লে গেছে ?"

"যাঁদের বিছানা-পত্র, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি ছিল, তাঁরা সব বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে ব'লে গেলেন—'রামগড় কংগ্রেসে যাচ্ছি।' —আর অধিকাংশেরই সম্বল ত একখানা সতরঞ্চ আর একটা সুটকেশ। তাঁরা তা বগলে পুরে নিয়ে, যেতে যেতে বল্লেন, 'রবিবারের চ্যারিটি ম্যাচটা দেখে আসি।'

"আর এই সব অত্যাচার ক'রে গেছে ?"

"হ্যাঁ। আর পাইখানার প্যান্‌গুলোও ইট মেরে সব ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।"

দালানের সেই তৈলস্রোতের উপরেই দ্বিজেন হতাশ ভাবে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

*   *   *

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোর্ডিংয়ের দ্বিতলের বারান্দায় মুখো-মুখী বসিয়া—দ্বিজেন ও মিস্ মায়া।

সেদিন চতুর্দ্দশী। সারা আকাশে আলোর প্লাবন বহাইয়া, তাহাদেরই ঠিক সামনে চাঁদ হাসিতেছিল এবং সারাদিনের অসহ্য গুমট্ ভাঙ্গিয়া মৃদু মৃদু শীতল বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছিল।

দ্বিজেন বলিল, "আপনাকে বরাবর রাখবো ব'লেই ত নিয়েছিলুম।"

৩

"তাই এখন নির্দ্দয় হ'য়ে দু'হাত দিয়ে ঠেলে দূর ক'রে দিচ্চেন!"

"কি করবো বলুন। সবই ত দেখলেন। কত ক্ষতি যে আমার হ'ল তা আর বলবার নয়।"

"ক্ষতি আপনার যথেষ্ট হ'য়েচে। কিন্তু আপনি বেটাছেলে, আপনার ক্ষতি একদিন-না-একদিন পূরণ হবেই। কিন্তু আমার কথাটা ভাবুন। ঘরে বুড়ো বাপ-মা। আমার উপায়ই তাঁদের ভরসা। এক সময়ে দু'জায়গাতেই আমার কাজ হ'য়েছিল, কিন্তু সেটাতে না গিয়ে এইখানেই এসেছিলুম। আমার যা ক্ষতি হ'ল তা আর পূরণ হবার নয়। কিন্তু মিষ্টার সেন—"

"কিন্তু কি ?"

একবার সম্মুখের আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া, একবার মেজের দিকে দু'চক্ষু নত করিয়া মায়া বলিলেন, "তো—তোমাকে দেখেই কিন্তু আমি এসেছিলুম এখানে। আমার সকল—"

মায়ার মুখ হইতে বাকী কথা আর বাহির হইল না।

কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব।

দ্বিজেন মধুরকণ্ঠে কহিল, "সবই বুঝতে পেরেছি, মায়া! আর কোনো দিকে কিছু আটকাবে না। তোমাকে পেলে, মনে করব, আমার সকল লোকসান উস্থুল হ'য়ে

গেল। আমার মায়ের কোন অমতই হবে না; কিন্তু তোমার বাপ-মার ?”

আনত দৃষ্টিতে মায়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন, “মত হবে।”

সিঁড়ির দরজায় কাহার ছায়া পড়িল।

ছায়া পরিতোষের। পরিতোষ দেখিল, দ্বিজেন সোজা হইয়া বসিয়া আছে। মায়ার মাথা তাহার বুকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। উভয়েই যেন বাহ্যজ্ঞান-রহিত। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া পরিতোষ সকলই শুনিয়াছিল। এখন অতি সন্তর্পণে কাছে আসিয়া কহিল, “সকলের সকল ক্ষতির ত পূরণ হ'লো, কিন্তু আমার ক্ষতিপূরণের কি উপায় হবে, দ্বিজেন ?”—বলিয়াই সে হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

স্বভন্-জাইটিস্

চায়ের বাটিটায় শেষ চুমুক দিয়া, স্ত্রী সাগরের হাত থেকে পানের খিলিটা লইয়া মুখে পুরিয়া, খগেন সিগারেট ধরাইল এবং এই হাল্কা সকাল বেলাটায়, হাল্কা মনে সাগরের সহিত একটু হাল্কা রসিকতা করিবার উদ্দেশে কহিল—“দেখ সাগর, যখন পুরীতে প্রথম সাগর দেখি—”

“খগেন বাড়ী আছ ? খগেন ! খগেন !”

চকিতে খগেন উঠিয়া শয্যায় গিয়া সটান শুইয়া পড়িল।

"ও খগেন! খগেন, বাড়ী আছ ?"

সাগরের দিকে চাহিয়া খগেন কহিল—"বল না—বাড়ী নেই।"

সাগর একটু বিরক্তমুখে কহিল—"আমি বউ মানুষ, আমি কি করে বলবো। তুমি বল।"

কিন্তু কাহাকেও আর বলিতে হইল না। আহ্বানকারী একেবারে স-শরীরে দালানের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই এক গলা ঘোমটা টানিয়া সাগর অদৃশ্য হইয়া গেল।

খগেন উঠিয়া আগন্তুকের পায়ে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া কহিল,—"শরীরটা ভাল নেই, তাই সকাল বেলাতেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ভাল আছেন ত মেসো মশাই ?"

"না বাবা। ভগবান কি আর ভাল থাকতে দেন! মেজ মেয়েটি এই সতের ছাড়ালো; ওর বিয়ের ভাবনাতে আমার আর তোমার মাসিমার গলা দিয়ে ত ভাত নাবচে না। তাই ভাবলুম, দেশ থেকে খোঁজা-খুঁজি ত সুবিধে হবে না, খগেনের ওখানে দিনকতক থেকে—"

"তা বেশ করেচেন। খুব একটি ভাল পাত্র ছিল,—রূপে, গুণে, বংশ-মর্য্যাদায়—কিন্তু—"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভোলানাথ বাবু কহিলেন—"কোথায় বাবা? ছেলেটির পড়া-শুনো—"

"এই শ্যামবাজারে। ছেলে পড়াশুনোয় একেবারে রত্ন; ট্রিপল্ এম, এ; বাপ মস্ত জমিদার—রায় বাহাদুর; কিন্তু—"

বিষম আগ্রহে ভোলানাথ বাবু কহিলেন—"কিন্তু কি বাবা? ছেলেটি বুঝি খুব কালো?"

"টক টকে রং।"

"তবে—তবে? কোন খারাপ অসুখ-টসুখ আছে না কি?"

"একেবারে নীরোগ। ঐযে বল্লুম, যেমন রূপ, তেমনি স্বাস্থ্য, তেমনি গুণ, তেমনি বংশ—"

"তবে—তবে—তবে! খুব খাঁই বুঝি?"

"ও জিনিসটা একেবারেই এদের নেই।"

"তা' হোলে খুব সুন্দরী মেয়ে চায় নিশ্চয়?"

"তা' নয়। তবে—"

"তা' হলে আর তবে কি বল।"

"সে ছেলের বিয়ে এই পরশু দিন হোয়ে গেল। একটু আগে হোলে আমি—আপনি বসুন মেশোমশাই, আপনার চায়ের কথাটা বলে আসি।"

খগেন সাগরোদ্দেশে চলিয়া গেল।

২

দিন তিনেক পরে একদিন দ্বিপ্রহরে আহারান্তে ভোলানাথবাবু বৈঠকখানা-ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভিতরের ঘরে খগেন ও সাগরের কথা হইতেছিল।

খগেন বলিল—"একটি মাস ও আর এখান থেকে নড়চে না। কি করে ভাগানো যায় বল দেখি? সেদিন আসবামাত্রই একটা খুব ভাল পাত্রের কথা পেড়ে ফেলেছিলুম। পেড়েই ভাবলুম যে, তা হোলেই তো এখানে চেপে বসবে। তাই কথাটা টপ্ করে উল্টে দিলুম। এখন ভাগাবার উপায় কি?"

"থাইসিসের ভয় দেখিয়েছিলে ত?"

"হ্যাঁ; বল্লুম—'পাশের বাড়ীর একজনের বিষম 'থাইসিস্' হোয়েচে।' কথাটাকে আমলই দিলে না। উল্টে আমাকেই সাহস দিলে; বল্লে—'ওসব ভয় করাটাই খারাপ, কিচ্ছু ভয় কোরো না খগেন, ভগবানের নাম নিয়ে গট্ হোয়ে বসে থাক; কিচ্ছু হবে না।"

অতঃপর অনেক জল্পনা-কল্পনার শেষে স্বামী-স্ত্রীতে চুপি চুপি কি-একটা পরামর্শ হইল এবং তাহার ফলে বিকালে খগেন স্ত্রীর সহিত ঝগড়া সূত্রে লম্ফ-ঝম্ফ এবং চীৎকারে বাড়ী একেবারে ফাটাইয়া তুলিল। ভোলানাথ-

বাবু খগেনকে বৈঠকখানা ঘরে ডাকাইয়া বহুবিধ বিহিত উপদেশ দিলেন ; কহিলেন—"স্ত্রীর সঙ্গে কি ঝগড়া-ঝাঁটি করতে আছে বাবাজী ? বৌমার সঙ্গে হঠাৎ কি নিয়ে ঝগড়াটা বাধলো ?"

খগেন যেন আগুন হইয়া বলিল—"ওর কথা আর বলবেন না মেসোমশাই ; দুষ্টুর একশেষ। বাপের বাড়ী চলে যাবে বলে ভয় দেখাচ্চে ; যাক্—দূর হোয়ে যাক্। হোটেল থেকে দু'বেলা গিয়ে খেয়ে আসবো।"

ভোলানাথবাবু একটু চিন্তিত হয়েই বল্লেন—"সত্যিই বৌমা যাবেন না কি ?"

"হ্যাঁ। ও যখন গোঁ ধরেচে, তখন ঠিকই যাবে। অর্থাৎ জানে কি না, যে, আমি রাঁধতে-টাঁধতে পারিনা, তাই—"

"আহা, তার জন্যে আট্‌কাবে না বাবাজী। আমি পঞ্চাশ জন লোকের রান্না দু'টি বেলা রাঁধতে পারি। ও-কাজটিতে তোমার মেসোমশায়…হাঃ হাঃ হাঃ—সে জন্যে অবিশ্যি ভয় নেই ; কিন্তু বৌমা যাবেন কি রকম ? তা কি কখনো হয় !"

সুতরাং তা আর হইল না। পরামর্শ ফাঁস হইল দেখিয়া বৌমা আর বৃথা বাপের বাড়ী গেলেন না। তিনি যেন মাস্-শ্বশুরের মান রাখিয়া থাকিয়া গেলেন।

রাত্রে আবার স্বামী-স্ত্রীতে চুপি চুপি কথা হইতেছিল।

খগেন কহিল—"এ ত সহজে যাবে না দেখচি !"

সাগর বলিল—"তাই ত দেখছি। সত্যিই আমি যদি চলে যেতুম, তা হোলেও উনি যেতেন না ; নিজেই রান্না-বান্না লাগিয়ে দিতেন ! উঃ ! তোমার কি রকম মেসোমশাই গো ?"

"আরে অনেক দূর সম্পর্ক। মা'র কি রকম মামাতো বোন হোত, সেই সম্পর্কে—" বলিতে বলিতে হঠাৎ খগেন একেবারে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—"হোয়েচে, হোয়েচে, খাসা মৎলব এইবার মাথায় এসেচে !"

"কি বল দেখি ?"

খুব আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে খগেন বলিল—"শোন। এবার বাছাধনকে নির্ঘাৎ ভাগাতে হবে। বাজারে শশী দত্তের দোকানের সেই ঘি পোয়াটাক আনিয়ে দি। সেই ঘিয়ে লুচি ভেজে দুটো দিন তোমার পূজনীয় শ্বশুর-মশাইকে খাওয়াও দেখি। পেটেন্ট ঘি বাবা ! পেটে পড়লেই, পেট নিয়ে অস্থির হোতে হবে, আহারাদি বন্ধ !"

সাগর কহিল—"সে আমি জানি। সেবার চারখানা লুচি খেয়ে, চারদিন ধরে বুক জ্বালায় অস্থির হোয়ে পাড়ছিলুম।"

অতঃপর মেসোমশায়ের জন্য শশী দত্তের দোকান হইতে সযত্নে এবং সমাদরে ঘৃত আনয়ন করা হইল।

৩

দুইদিন পরের ঘটনা।

"এক ডোজ পাল্‌সেটিলা দেবো কি মেসোমশাই ?"

"উঃ! পেটের ভেতরটায় কি হোঁচড়-পোঁচড়ই যে কচ্চে!—এ রকম ত কখনো আমার হয় না খগেন!"

"ঐ একটা নতুন রোগ আজকাল এখানে বড্ড হোচ্চে মেসোমশাই। প্রথমে গলা জ্বালা; তারপর পেটের যন্ত্রণা; তারপরই—! ডাক্তাররা বলে—ঘৃতন্‌জাটিইস্‌! কোত্থেকে সব নতুন রোগ আস্‌চে কোলকাতায়—"

"উঃ-হু-হু, বড্ড সেঁটে ধরলো যে!—খগেন, বেলা এখন ক'টা ?"

"সাড়ে দশটা।"

"এগারটা বিশে একটা ট্রেণ আছে। তুমি একখানা ট্যাক্সি আন বাবা; এই ট্রেণটায় আমি বাড়ী চলে যাই। কি বল্লে ?—ঘৃতন্‌—"

"জাইটিস্‌।—আপনি কোন ভয় করবেন না মেসোমশাই, হয় ত সেরে যেতেও পারে। ও-পাড়ায় ঐ নীলমণি বোসের—

"উঃ! বাপ!—খগেন, তুমি বাবা শীগ্‌গীর একখানা ট্যাক্সি ডেকে আন।"

* * *

ঠং—ঠঠং ঠং—ঠঠং ঠং।

ট্রেণ ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পেটের অসহ্য যন্ত্রণা অসীম বলে সহ্য করিয়া, গাড়ীর সিটে উপবিষ্ট ভোলানাথবাবু, প্ল্যাটফরমে দণ্ডায়মান খগেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তা হোলে চল্লুম বাবা!—উঃ!" সঙ্গে-সঙ্গেই মুখখানা তাঁর ভয়ানকভাবে সিট্‌কাইয়া উঠিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। খগেন সবিষাদে কহিল—"পৌঁছেই একখানা চিঠি দেবেন মেসোমশাই। আমরা খুবই ভাবিত হোয়ে থাকলুম। দিনকতক থেকে গেলেই হোত।"

"কি নামটা বল্লে, বাবাজী? ঘৃতন্—?"

"—জাইটিস্!"

নৌকাডুবি

সকাল বেলা।

টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল।

নিশিকান্ত আকাশের দিকে চাহিল; এবং চাহিয়াই রহিল। কিন্তু একথা খুবই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, তাহার মনে কোন প্রকার কবিত্ববোধ জাগে নাই। জাগিয়াছিল—গরম গরম ছোলাভাজার বোধ। তাই—শূন্য আকাশ পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, আধ-পয়সার ছোলাভাজা কিনিলেই একটা পয়সা ভাঙ্গাইতে হইবে। বাকী আধলাটাও থাকিবে না, কোন কিছুতে ঠিকই খরচ হইয়া যাইবে; গোটা-জিনিষ ভাঙ্গাইলে যা হইয়া থাকে। সুতরাং ছোলাভাজার কথাটা ভুলিবার জন্য সে এইভাবে তাহার মনকে অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যথা :—মেঘগুলো যেন ঠিক পেঁজা

তুলো। এত মেঘ আসে কোত্থেকে? বারো মাস যদি বৃষ্টি হোত, তা হোলে পৃথিবী ভেসে যেতো। ওঃ! রাস্তায় কত জল দাঁড়িয়েচে!—লোকটা ভিজতে-ভিজতেই চলেছে। বোধ হয় ছোলাভাজা-টোলাভাজা কিছু কিনতে যাচ্চে আর কি।—নিশিকান্ত একান্ত চেষ্টায় যতই ছোলাভাজার কথাটা মনের মধ্যে চাপা দিতে চায়, তাহা ততই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া পড়ে। অবশেষে

মনটাকে বিষয়ান্তরে ভালভাবে নিবিষ্ট করিবার উদ্দেশে রন্ধনশালায় রন্ধনরত স্ত্রীর কাছে আসিয়া একটা বাজে গল্পের উপক্রমণিকা সুরু করিতেই, বনমালা বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল—"নিষ্কর্ম্মা লোকের বাজে বকবার সময় থাকতে পারে, কিন্তু কাজের লোকের তা শোনবার সময়

থাকে না।” বলিয়াই বনমালা, পাঁচফোড়নের দরকার না থাকিলেও ভঁাড়ার হইতে পাঁচ-ফোড়ন আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে কহিল—“কোন কাজ না থাকে, খই ভাজো গে।”—আবার সেই ভাজা! খই-ভাজা, মুড়ি-ভাজা, চাল-ভাজা ক্রম-বিকাশের ধারা অনুযায়ী, তা'র পরই আসে—ছোলাভাজা।

বনমালার কথার ধাক্কায় নিশিকান্ত প্রথমে সদর দরজায় এবং পরে সেখান হইতে এক-পা এক-পা করিয়া নিকটস্থ চাল-ছোলা ভাজার দোকানে গিয়া হাজির হইল এবং আধ-পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়া আনিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া তাহারই ভক্ষণকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

আধ-পয়সার ছোলাভাজা: এক মিনিটেই শেষ! আধেয় গিয়াছে উদরে, আধারটি রহিয়াছে হাতে—কাগজের তৈয়ারী একরত্তি শূন্য ঠোঙ্গাটি। সেইটি নাড়িতে নাড়িতে, যেখানে উহার বুকটি লম্বাভাবে বরাবর আঠা দিয়া জোড়া ছিল, নিশিকান্ত সেইখানটা খুলিয়া ফেলিল। গোল-গাল ঠোঙ্গাটা পাত্ হইয়া তাহার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। তাহা ‘দৈনিক বঙ্গভাষী’ পত্রিকার একটুখানি ছিন্ন অংশ। যে কয়টা লাইন তাহার উপরদিকে লেখা ছিল, নিশিকান্ত তাহা পড়িতে সুরু

করিল ঃ—'শীঘ্রই কথা-কহার জন্য গৃহে গৃহে ট্যাক্স বসিবে। অবশ্য এই ট্যাক্সই যে শেষ, তাহাও আমাদের মনে হয় না। কথা-কহার ট্যাক্সের পরে হয় ত বায়ু হইতে প্রশ্বাস লইবার জন্যও প্রত্যেকের উপর ট্যাক্স বসিবে সুতরাং ইহা লইয়া টীকা-টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।' —ইহার পর অন্য সংবাদ লিখিত ছিল। কিন্তু উপরের ঐ সংবাদটুকু পড়িয়াই নিশিকান্ত তৎপ্রতি অতিমাত্রায় মনোযোগী হইয়া পড়িল।—ভারী দরকারী খবর ত! শীঘ্রই কথা-কহার জন্য ট্যাক্স বসিবে? কি সর্ব্বনাশ! কবেকার বঙ্গভাষী?

খবরটার গোড়ার দিকের লাইন কয়টা নাই, সেখান থেকেই কাটা পড়িয়াছে। কাটা পড়িবার আগে, সংবাদটা যাহারা পড়িয়াছিল, তাহারা এইরূপ পড়িয়াছিল, —'গভর্ণমেণ্ট এখন হইতে তামাকের উপর ট্যাক্স বসাইলেন। দিয়াশালাইয়ের উপরও ট্যাক্স বসিয়াছে। চম্‌কাইবার কিছুই নাই। হয় ত শীঘ্রই কথা-কহার জন্য গৃহে গৃহে ট্যাক্স বসিবে। অবশ্য এই ট্যাক্সই যে শেষ, তাহাও আমাদের······ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত লেখাটার প্রথমাংশটুকু না থাকাতে, যেটুকু আছে তা পড়িয়া নিশিকান্ত একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। কথা-কহার উপর ট্যাক্স বসিলে তাহাকে যে মোটা ট্যাক্স দিতে

হইবে। যেহেতু ঘরে-বাহিরে তাহার মস্ত দুর্ণাম যে, সে না কি বড় বেশী কথা কয়। দুর্ণাম অবশ্য আরও দু'একটা আছে। তাহার মত কৃপণ নাকি জগতে নাই, কথাটা যে মিথ্যা তাহা সে প্রমাণ করিয়া দিতে পারে। তাহাপেক্ষাও বেশী কৃপণ কে একজন নাকি কাশীতে আছেন। বরানগরেও এক জন ওই রকমই মহাকৃপণ আছেন। সুতরাং তাহার মত কৃপণ 'জগতে নাই'—কথাটা নিঃসন্দেহ অত্যুক্তি দোষদুষ্ট। তারপর, লোকে যে বলে —'নিশিকান্ত হোল একটা খাজা মূর্খ,'—কথাটা একেবারে বাজে। ক্লাস ফোর পর্য্যন্ত সে পড়িয়াছে এবং একবার ছাড়া সে কখনো পরীক্ষায় ফেল্ হয় নাই। সুতরাং······

তবে—কথাটা সে একটু বেশী বলে বটে, এটা সে নিজেও স্বীকার করে। ইহার একটু বৈজ্ঞানিক কারণও থাকিতে পারে। উচিত মত অর্থব্যয় যেখানে নাই, সেখানে অনুচিত মত বাক্যব্যয় দ্বারা হয় ত সেই 'নাই'-য়ের সামঞ্জস্যতা রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু লোকে সেদিকটা একবার ভাবিয়াও দেখে না।

কিন্তু এ সব কথা ভাবিয়া এখন কোন ফল নাই। কথা-কহার ট্যাক্স বসিলে······। কবে হইতে বসিবে? 'বঙ্গভাষী'তে যখন বাহির হইয়াছে তখন খবরটা যে খাঁটি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু······।

এই কিন্তুর সূত্র ধরিয়া, বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত নিশিকান্তর মনের আকাশেও দুশ্চিন্তার মেঘ জমিয়া উঠিতে লাগিল। কাগজখানা হাতে করিয়া সে রাস্তার দিকের জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ একটা পূবে বাতাসের ঝাপ্টা আসিয়া তাহার হাতের কাগজখানাকে, প্রথমে ঘর হইতে দালানে এবং পরে দালান হইতে উঠানে উড়াইয়া লইয়া গেল।

দণ্ডাদেশযুক্ত রায়ের নকল যেমন আসামীর কাছে প্রিয় না হইলেও সে তাহাকে হস্তগত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে, নিশিকান্তও তদ্রূপ হস্ত হইতে পলায়িত, ট্যাক্সের সংবাদসমন্বিত সেই কাগজখণ্ডকে ধরিবার জন্য উহার পিছু

পিছু ছুটিল। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিল না। সে এলো-মেলো বাতাসের ঝাপটায় নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখে পাইখানার দরজা খোলা পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং প্যানের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। অগত্যা নিশিকান্ত বিফল মনোরথ হইয়া পুনরায় জানালার ধারে আসিয়া বসিল।

সামনের ফুটপাথ দিয়া শিবকালী বাজার করিয়া ফিরিতেছিল। নিশিকান্ত তাহাকে ডাকিয়া কহিল—"শুনেছ—কথা বলার যে ট্যাক্সো বস্‌চে!"

শিবকালীর বাড়ীতে কুটুম আসিয়াছে। সে খুবই ব্যস্ত। বাজার লইয়া গেলে তবে রান্না চড়িবে। শিবুর মন সেই দিকেই পড়িয়া আছে। সুতরাং নিশিকান্তর কথাগুলা তাহার কাণে ঠিকমত পৌঁছাইল না। সে যেন শুনিল—'কথা-বলা ট্যাক্সি এসেচে।' শিবকালী আর না দাঁড়াইয়া চলিতে চলিতে কহিল—"শুনিছি নিশি দা'। সেদিন বঙ্কুবাবুর বাড়ী থেকে শুনে এলুম।"

চম্‌কাইয়া উঠিয়া নিশিকান্ত মনে মনে বলিল—বঙ্কু বাবু! সেখান থেকে শিবু এ খবর শুনে এসেছে! তা' হোলে আর কোন সন্দেহ নাই,—একেবারে নীট্ খবর!

আসল কথাটা কিন্তু এই—বঙ্কুবাবুর বাড়ীতে সেদিন কে-এক বাবু বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। গাড়ী-বারান্দার মধ্যে তাঁর শূন্য মোটরটি ছিল দাঁড়াইয়া আর তাহার মধ্য

হইতে 'রেডিও'-সংযোগে কিসের একটা বক্তৃতা চলিতেছিল। সেইদিনই শিবকালী বঙ্কুবাবুর নিকট হইতে শুনিয়া আসিয়াছিল যে, আজকাল মোটর-ট্যাক্সীতে রেডিও বসান হইতেছে। সুতরাং কথা-কওয়া মোটর বা ট্যাক্সীর কথা সে যে শুনিয়াছে তাহা ত ঠিকই।

নিশিকান্ত ভাবিল, বঙ্কুবাবু হলেন হাকিম লোক; খবরের গেজেট বল্লেই হয়। সুতরাং শিবু যখন ওইখান থেকে কথাটা শুনে এসেছে, তখন এ কথা একেবারেই পাকা।

এমন সময় নন্দলাল পাণ চিবাইতে চিবাইতে এবং সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আফিস যাইতেছিল। নিশিকান্তর ডাকে সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিশিকান্ত কহিল—"শোননি বোধ হয়, কথা বলার ওপর যে ট্যাক্স বসবার ব্যবস্থা হচ্চে।"

নন্দলাল হইল সেই প্রকৃতির লোক, যে সব বিষয়েই —সত্য করিয়াই হউক, আর মিথ্যা করিয়াই হউক— 'সব-জান্তা' হইতে চায়। কেহ যে তাহার অপেক্ষা কিছু বেশী জানিবে বা আগে জানিবে, ইহা সে হইতে দিবে না। সুতরাং টপ্ করিয়া বলিল—"অনেকদিন আগে শুনিচি। আইনের যখন খসড়া তৈরী হয়, তখনই আমি

······হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ! মিষ্টার তাজমল খাঁর ভাইপোর ভায়রা-ভাই হোল আমার একেবারে—যাকে বলে বুজুম্-ফ্রেণ্ড। সুতরাং·········।

আফিসের সময় হইয়া আসিয়াছিল। নন্দলালের যদিও আরও কিছু বলিবার অভিলাষ ছিল, কিন্তু পারিল না। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিশিকান্ত তাহার উদ্দেশে মনে মনে বলিল—"তোমাদের আর কি বল? সারাদিনটা ত তোমাদের কাটে আফিসে। যত কথা, যত গাল-গল্প—সব ত তোমাদের সেইখানেই। এদিকে বউটিকে ত খেয়ে বসে আছ; ঘরে আছে খালি এক বুড়ো পিসী। বাড়ীতে তার সঙ্গে আর কি-এমন কথা কইবে? বিপদ আমার! আমার না আছে আফিস, না আছে বুড়ো পিসী। যিনি ঘরে আছেন, তাঁকে পঁচিশটা কথা বললে তবে একটার উত্তর পাওয়া যায়। সুতরাং রোজ হাজার পাঁচেক কথা তাঁর উদ্দেশেই কইতে হয়। বিপদ ত আমারি!"

নিশিকান্ত চিন্তার অকুল সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।—কথা-বলার ট্যাক্‌সো দিতে হোলে, সকলের আগে আমাকেই ত মরতে হবে। কত করে ট্যাক্‌সো ধরবে? আচ্ছা, কত কথা কওয়া হোল তা'র ঠিক পাবে কেমন করে?—তা'র আর কি; মিটার বসাবে।

মিটারে সব উঠে পড়বে। যা উঠবে, তার থেকে সম্ভবমত 'লেস্ ডিস্কাউণ্ট' (Less discount) বাদ দিয়ে, তার উপর ট্যাক্স ধরবে।—উঃ! সারবে আমাকে এইবার! —কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—ট্যাক্স আমি কিছুতেই দিচ্চিনা! তা হোলে মরেই যাব! বরং কথা কহাই আমি বন্ধ করব।—হ্যাঁ করব। ঠিকই করব। নিশ্চয়ই করব।

কিন্তু—'হ্যাঁ করব, নিশ্চয় করব' বলিলেই ত আর হয় না। কি করিয়া করিবে? রোজ কম পক্ষে সে হাজার পাঁচেক কথা বলে। খুব চেষ্টার দ্বারা না হয় সংখ্যাটাকে কমাইয়া সে হাজারে আনিতে পারে। লেস্ ডিস্কাউণ্ট (Less discount) আর কতই হইবে? না হয় এক-শো, বা দেড়-শো? বড় জোর না হয় দুই-শো? তাহা হইলেও মিটারে রোজ আট-শো উঠিবে। তাহা হইলেই মাসে প্রায় পঁচিশ হাজার কথার উপর ট্যাক্স ধার্য্য হইবে। হাজারে চার আনা হিসাবে যদি ট্যাক্স ধরা হয়, তাহা হইলেই ত মাসে সওয়া ছয় টাকা। ইহার বেশীও হইতে পারে। তাহা নির্ভর করে বনমালার উপর। অর্থাৎ বনমালার মেজাজ যদি অন্তত মাসের অর্দ্ধেকদিন একটু বেশী রকম সন্তোষজনক থাকে, তাহা হইলে সওয়া ছ'য়ের স্থলে সওয়া বার'—এমন কি তাহারও বেশী হওয়া বিচিত্র নহে।

নিশিকান্ত প্রতিজ্ঞা করিল, সে দৈনিক বিশ-পঁচিশটির বেশী কথা কিছুতেই কহিবে না,—তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও না। আজই সে এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। আজ সে একটা কথাও কহিবে না, আধখানাও না। আজ যদি সে মোটে কথা না কহিয়া কাটাইতে পারে, তাহা হইলে ট্যাক্স বসিলে সে অনায়াসে বিশ-পঞ্চাশটা বা ঊর্দ্ধসংখ্যা একশোটা কথা কহিয়া কাটাইয়া দিতে পারিবে।

কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—

অর্থাৎ—হঠাৎ আজ একটা-কোন কারণ ছাড়া কথা একেবারে বন্ধ করেই বা কি করিয়া? কথা বন্ধের একটা হেতু বা উপলক্ষ চাইত!

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উপলক্ষের বিষয় চিন্তা করিবার পর নিশিকান্ত দেখিল যে বনমালার উপর ভীষণ রাগ করা ছাড়া উপায় নাই। সারাটা দিন-ই আজ তাহার উপর খুব রাগ করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু শুধু-শুধুই বা তাহার উপর রাগ করে কি করিয়া। বনমালার প্রতি অকারণে—

অকারণ ত নয়। বেশ সুন্দর কারণ রহিয়াছে। কেন সে নিশিকান্তকে খৈ ভাজার কথা বলিল? সে ত অন্য কিছু বলিতে পারিত। নিশিকান্ত ভাজিবে—খৈ!

সে কি পুরুষ মানুষ নয়, মেয়ে ছেলে—যে সে খৈ ভাজিবে? তাহার চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কেহ কখনো খৈ ভাজে নাই। তাহার খুড়ার মাছধরার সখ ছিল বলিয়া কখনো কখনো চারের মশলা ভাজিত বটে কিন্তু খৈ……! এত বড় স্পর্দ্ধা!

নিশিকান্ত ভীষণ ভাবে চটিয়া গেল এবং কিছু পরে গুম্ হইয়া বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তেল মাখিল। তাহার পর স্নানান্তে ভাতের অপেক্ষায় নীরবে বসিয়া রহিল।

আজ বনমালা দা'লে নুন দিতে ভুলিয়াছে। ঝোলেও ঝালের মাত্রা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। নিশিকান্ত বিনা বাক্যব্যয়ে কোনরকমে আধ-খাওয়া খাইয়া বিরক্তমুখে উঠিয়া গেল।

যে প্রচণ্ড রাগ খৈ-য়েতে সুরু হইয়াছে, তাহা দা'ল ও ঝোলে মিশিয়া প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল।

বেলা প্রায় একটার সময় আহারাদি সারিয়া বনমালা শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল, তাহার 'বনমালী'টি মুখখানাকে বিকট কবিয়া,—কট্-মট্ দৃষ্টিতে দেওয়ালে বিলম্বিত তাহারি কুমারী আমলের একখানা ফটোর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কহিল—"আসল মানুষ সামনে থাকতে, ছবিখানাকে ভষ্ম করে আর লাভ কি?"

নির্ব্বাক থাকিয়া নিশিকান্ত বিরক্ত মুখখানাকে অন্যদিকে ফিরাইল।

"ডালে নুন দিতে ভুলিচি বলে খুব রাগ হ'য়েচে তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তখন যদি বলতে ত একটু নুন দিয়ে ফুটিয়ে দিতে পারতুম।"

কিন্তু শুধু ডালে নুন লইয়া ত কথা নয়। আসল কথা—খৈ ভাজা। তার উপর আলুনি ডা'ল আর ঝোলের ঝাল মিলিয়া তাহার রাগকে ত্রিশক্তিসমন্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

নিশিকান্তর ইচ্ছা—খুব একচোট্ শুনাইয়া দেয়; কিন্তু তাহার ত কথা কহিবার উপায় নাই। বরং বনমালার এই অসময়ের ভূমিকাটাতে সে নিজেকে ভিতর ভিতর আরও রাগান্বিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকাল হইতে এই বেলা একটা পর্য্যন্ত সে কথা না বলিয়া কাটাইয়াছে। আর কয়েক ঘণ্টা কাটাইতে পারিলেই ত হয়। তাহা হইলে, কেমন করিয়া তাহার ট্যাক্স বসে, সে একবার দেখিয়া লইবে।

বনমালা দেখিল, এত রাগ ত নিশিকান্ত কোনদিনই করে না। হো'ক না কেন ডাল আলুনি, ঝোলে ঝাল, কোনদিনই তাহার প্রিয়তমটি ত এরূপ কঠিনতম হয় না। তাহার উপর রাগ করা দূরের কথা, একদণ্ড তাহাকে না

দেখিয়া বা তাহার সহিত কথা না কহিয়া সে থাকিতেই পারে না। কিন্তু আজ……!

কিন্তু রাগ যখন হইয়াই পড়িয়াছে, তখন আর উপায় কি! এরূপক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য, অতঃপর বনমালা তাহাই করিল। অর্থাৎ ভাল করিয়া দুই খিলি পাণ সাজিয়া আনিয়া হাসিমুখে স্বামীর সামনে ধরিল। বলিল —"মুখের রস আজ একেবারেই শুকিয়ে গেছে ; পাণ দু'খিলি খাও দিকি, একটু সরস হবে'খন।"

গম্ভীর মুখখানাকে নিশিকান্ত অন্য দিকে ফিরাইল।

তখন বনমালা অতি মৃদুকণ্ঠে সুর করিয়া বলিল—

"হোয়ে থাকি অপরাধী,
এস ওগো গুণনিধি,
তব প্রেম-পাশে বাঁধি,
সাজা দেও দাসীরে।"

ধাঁ করিয়া বনমালার হাত হইতে পাণের খিলি দুইটা ছিনাইয়া লইয়া নিশিকান্ত ঘরের এক কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বনমালা কহিল—"বুঝতে পেরেছি। আজ যে পেট-ই খালি। খালি পেটে পাণ।—দাঁড়াও, আমি দোকান থেকে খাবার আনিয়ে দিচ্চি।" বলিয়া বনমালা বালিসের তলা থেকে বাক্সের চাবিটা লইল।

নিশিকান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কি করিয়া সে বারণ করে? এখনি হয়ত চারগণ্ডা পয়সার খাবার আনাইয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া বসিবে! কাগজে লিখিয়া বনমালার চোখের সামনে ধরিলে হয়। কিন্তু ঘরে ত সাদা কাগজ নাই। পেন্সিল দিয়া ঘরের মেজেতে লিখিয়া দিলেও চলে। কিন্তু পেন্সিলই বা কোথায়? দোকান হইতে কিনিতে গেলে এখনি একটা পয়সা দাম লইবে। আর সে সময়ও নাই। খোলাম-কুচি দিয়া লিখিলেও হয়। পাইখানার পিছন দিকটায় অনেকগুলো খোলাম-কুচি পড়িয়া আছে। নিশিকান্ত আনিতে ছুটিল।

এদিকে বনমালা পাশের বাড়ীর গৌরকে ডাকিয়াছে। গৌর আসিলে বনমালা তাহাকে বলিল—"তোর কাকা-বাবুর আজ খাওয়া হয় নি বাবা। ঐ মোড়ের দোকান থেকে এক টাকার ভাল দেখে খাবার আনতে পারবি?"

গৌর সোৎসাহে বলিল—"পারব খুড়ীমা।"

বনমালা বাক্স খুলিয়া তাহার হাতে একটা টাকা দিল।

নিশিকান্ত অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার হাতের খোলাম-কুচি হাতেই রহিল।

বনমালা গৌরের দিকে চাহিয়া কহিল—"সিঙ্গাড়া, কচুরি, মিহিদানা, রসগোল্লা—সব রকম মিলিয়ে একটাকার এনো।"

নিশিকান্ত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, তাহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল ; গা ঘামিয়া উঠিল।

বনমালা কহিল—"দেরী কোরো না বাবা ; ছুটে যাও।"

চক্ষের নিমিষে নিশিকান্ত লাফাইয়া উঠিল। গৌরের মুঠার মধ্যে টাকাটা চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বনমালাকে বলিয়া উঠিল—"আহা, হা, কর কি ছাই ! রাগ আমি করিনি কো ! টেক্‌সোর জন্যে আজ……

"টেক্‌সো ! কিসের টেক্‌সো ?"

"কথার টেক্‌সো ! কথার টেক্‌সো। এস, সব বলচি।"

নৌকা মাঝ-দরিয়ার কাছাকাছি আসিয়া ডুবিয়া গেল।

আর সেই সঙ্গে বনমালা অবাক হইয়া নিশিকান্তর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্

'যা' রটে, তা' কতকটা বটে'—এই প্রবাদবচন হিসাবে স্বীকার করি যে, কালিদাস কতকটা কৃপণ স্বভাবের লোক বটে কিন্তু তাহার দোষের দিকটা লোকে যেমন দেখে, তাহার গুণের দিকটা ত তেমন দেখে না। কালিদাস কথঞ্চিৎ কৃপণ বটে, কিন্তু সে যে অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী, গো-বেচারী গোছের লোক এবং অতিমাত্রায় হিসাবী—সে জন্য ত কেহ তাহার প্রশংসা করে না। সুতরাং লোকের পক্ষেও ইহা অতীব অন্যায়। তাহার নামে যদি লোকের হাঁড়ি ফাটে, তাহা হইলে হাঁড়ির দোষেও যে ফাটিতে পারে, কিম্বা লোকের ঐ অতীব অন্যায়ের জন্যও যে ফাটিতে পারে, কোন বিচারপরায়ণ ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

চন্দন অস্ত্রাঘাত পাইয়া এবং পেষিত হইয়াও সকলকে সুবাস বিতরণই করে। নিজের দুর্ণামে কালিদাসের রাগও নাই, দুঃখও নাই; বরং অত্যন্ত বিনম্র বচনে সকলকে বলে—"ব্যয় ত সকলেই করে, কিন্তু অ-ব্যয় ক'টা লোকে করতে পারে!"—ভারী খাঁটি কথা! সেই অনাদি-অনন্ত-অব্যয়ের কৃপা না হইলে এ-কথা বুঝিবে কে?

সেদিন আফিস হইতে আসিয়া, সন্ধ্যার পর অন্ধকার গৃহে বসিয়া কালিদাস মনে মনে এই ব্যয়-অব্যয়ের হিসাব করিতেছিল।—বর্ত্তমানে তাহার যাহা মাসিক ব্যয় পড়িতেছে, কি উপায়ে তাহা কমানো যায়,—তাহারই হিসাব।

সংসারে খরচ—তাহাদের স্বামী-স্ত্রী—একটি প্রাণীর। স্বামী-স্ত্রী এক প্রাণ—এক আত্মা বলিয়া যে একটি প্রাণী, তা' নয়। অব্যয়ের সাধনার জন্য, কালিদাস স্ত্রীকে, তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়াছে। কলিকাতা হইতে সে স্থান পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে। কলিকাতায় কালিদাস একাই অবস্থান করে, এক বেলার স্ব-পাক দ্বারা দুইবেলা চালায়; অন্ধকার ঘরে বসিয়া এইরূপ ভাবে, আর প্রতি মাসে দুই শনিবার 'উইক্-এণ্ড' টিকিটে মার্টিনের রেলে চাপিয়া শ্বশুরালয় যায়।

বাসন-কোসন মাজা, ঘর-দুয়ার ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতির জন্য একটা ঝি আছে। তাহাকে তিন টাকা করিয়া দিতে হয়। শ্বশুরবাড়ী দুই ক্ষেপ যাইতেও মাসিক নয় সিকা ব্যয় হয়; একুনে সওয়া পাঁচ টাকা। স্ত্রীকে আনিলে, স্ত্রীর খাওয়া ও পরা—এই সওয়া পাঁচ টাকার মধ্যেই চলিয়া যায়; লাভের মধ্যে তাহাকে শ্বশুরবাড়ী ছুটা-ছুটি করিতে হয় না ও হাত পুড়াইয়া খাইতে হয় না।

সুতরাং কালিদাস সৌদামিনীকে আনাই স্থির করিয়া ফেলিল এবং পরের সপ্তাহেই তাহাকে কলিকাতায় আনিল। বলা বাহুল্য, সঙ্গেসঙ্গেই ঠিক ঝির এবং মার্টিন কোম্পানির আয়ের খাতা হইতে যথাক্রমে ৩৲ ও ২।০ হিসাবে ঘাট্‌তি পড়িল।

আসিবার পূর্ব্বে সৌদামিনীকে যদিও তাহার জননী কাণে-কাণে অনেক কিছু উপদেশ দান করিয়াছিল কিন্তু তাহার কোনই আবশ্যকতা ছিল না, যেহেতু বুদ্ধিমতী বলিয়া সৌদামিনীর যথেষ্ট সুনাম ছিল।

সুতরাং মাসখানেক পরে এক রবিবার দ্বিপ্রহরে কালিদাস খাইতে বসিলে সৌদামিনী পাখা হাতে সাম্‌নে আসিয়া বসিয়া কহিল—"আজ ত আর খেয়ে আফিস

ছুট্‌তে হবে না। আজ একটু ভাল করে পেট ভরে খাও দেখি। মোচার ঘণ্টটা ভাল হয় নি বুঝি?"

"কেন? বেশ হোয়েছে ত! তোমার সোনার হাতের রান্না কি খারাপ হতে পারে!"

মৃদু-মধুর হাসির সহিত সৌদামিনী কহিল—"সোনার হাত না ছাইয়ের হাত! তবে সোনার চুড়ী ক'গাছা হাতে, আছে বটে।—হ্যাঁ, ভাল কথা। কি করা যায় বল দেখি?"

"কিসের?"

"মাগ্যির সোনা; দু'বেলা বাসন মাজবার ফলে চুড়ীগুলো ভয়ানক ক্ষয়ে যাচ্ছে। শুনিছি, বাসন মাজলে ভরি পিছু দু'আনা করে সোনা বছরে ক্ষয়ে যায়।"

ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া কালিদাস কহিল—"বল কি! বছরে ভরি পিছু দু'আনা! তাহোলে ত দশভরির চুড়ী ক'গাছা আট বছরেই উবে যাবে! খুলে ফেল, খুলে ফেল; খুলে তুলে রাখ।"

"তা রাখবার হোলে কি আর রাখতুম না। হাতের চুড়ী আমাদের বংশে কারুর খুলতে নেই।"

"খুলতে নেই? কেন?"

মাটির দিকে মুখ নীচু করিয়া সৌদামিনী বলিল—

"স্বামীর অ-কল্যাণ হয়। চুড়ী আমি হাত থেকে কিছুতেই খুলতে পারব না।"

ভাল করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার স্থলে, কালিদাসের আর খাওয়াই হইল না—বছরে ভরি পিছু দু'আনা সোনা-ক্ষয়! তাহার প্লীহা চমকিত এবং চক্ষু চড়ক-বৃক্ষে পরিণত হইল।

সারাদিন নানাপ্রকার দুশ্চিন্তার পর অবশেষে সৌদামিনীর পরামর্শে বাসন-মাজা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য একজন চাকর রাখা ঠিক হইল এবং পরদিনই খোরাকী ও চারিটাকা মাহিনায় ফেলারাম নিযুক্ত হইল।

* * *

মাসখানেক পরে একদিন বৈকালে দালানে বসিয়া সৌদামিনী একটি প্রৌঢ়া বিধবার সহিত কথা কহিতেছিল।

স্ত্রীলোকটি কহিল—"মা, ছ'টা করে টাকা আমায় দেবেন, দেখবেন—আমার দ্বারা আপনার—

"না মা, ওই পাঁচটাকা করে দেবো। লোক ত আমরা দু'টি আর চাকরটা, সুতরাং—কাজ ত ধরতে গেলে কিছুই নয়। আমার যে আগুনের তাত্ সয় না, নইলে দু'টি প্রাণীর রান্নার জন্যে আর—।"

স্ত্রীলোকটি অবশেষে রাজী হইল ; কহিল—"আচ্ছা মা, তা'ই দেবেন। কি কোরবো'! কোন দিকে কুলোন্ করতে পারি না। ভগবান মেরেচেন মা, নইলে—। দেশে উপযুক্ত ভাই, ভা'জ। বেরী-বেরী হয়ে ভাইটির দু'টি চোখই একেবারে নষ্ট হোয়ে গেছে। তাই ত এই বয়সে মা——"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কালিদাস আফিস থেকে আসিলে তাহার জলখাবারের জন্য সৌদামিনী একখানি রেকাবীতে করিয়া দু'খানা পাঁপরভাজা ও খানিকটা হালুয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া চা আনিতে গেল।

সৌদামিনীকে আনিবার পূর্ব্বে কালিদাস আফিস হইতে গৃহে আসিবার পথে, 'চাচার চা' নামক দোকান হইতে প্রত্যহ হাফ্-কাপ্ চা খাইয়া আসিত। এখানে আসিবার পর সৌদামিনী কহিল—"আমারও ত হাফ্-কাপ্ চাই। সুতরাং দু'জনের দু'পয়সাতে বাড়ীতেই ভাল দু'কাপ চা হবে'খন।" তদবধি বাড়ীতেই প্রত্যহ চা হয়। সপ্তাহখানেক পরে চা'য়ের সহিত একটু হালুয়ার, এবং আরও সপ্তাহখানেক বাদে পাঁপরভাজার যোগসাধন ঘটে—ক্রমোন্নতির ধারা অনুসারে।

চায়ের কাপটা কালিদাসের পাশে রাখিয়া দিয়া, সৌদামিনী টিপি-টিপি হাসিতে হাসিতে কহিল—"আজ একটা বীচি পুতেছি।"

"কিসের গো ?"

"টাকার গাছের।"

"টাকার গাছের ! তার মানে ?"

"তার মানে,—একটি বিধবা মেয়ে-লোকের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে সেদিন ভাব হোয়েছিল। তিনকুলে তার কেউ নেই। থাকবার মধ্যে, হাতে তার বেশ-কিছু টাকা-পয়সা আছে। তা, জমানো টাকার একটি পয়সাও খরচ করবে না। লোকের বাড়ী তাই রান্নার কাজ কোরে খায়।"

"তাকে এখানে বাহাল করতে চাও না কি ?"

"চাওয়া ছেড়ে, করেই ফেলেচি। কাল সকাল থেকে আসবে। কত বড় দাঁওটাকে ঘরে ঢোকালুম—বুঝতে পেরেছ ? বয়স হোয়েচে, ক'টা দিনই আর বাঁচবে ! তখন তা'র সমস্ত টাকাগুলি আমাদের বাক্সে এসে······"

"কত টাকা আন্দাজ আছে ?"

"তা কি ভাঙ্গতে চায়। তবে হাজার-পাঁচেক ত বটেই। মাথায় একটু ছিট্ আছে নিশ্চয়। নইলে এ অবস্থায় কাশী কি বিন্দাবনে গিয়ে বেশ সুখে থাকলেই ত পারে, তা থাকবে না। ও-দিক্‌টার ছোট ঘরখানাতে সে থাকবে এখন। বিধবা লোক, একবেলা একমুঠো খাবে, আর মাইনে ঠিক হোয়েচে—পাঁচ টাকা। ভাবলুম,

পাঁচ টাকাই হোক আর পঁচিশ টাকাই হোক, সে ত আমাদেরই এ-বাক্স থেকে ও-বাক্সে রাখা।” বলিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে সৌদামিনী কালিদাসের মুখের দিকে তাকাইল এবং কালিদাসের মাথায় যে-একটি কুটি পড়িয়াছিল, তাহা তাহার নবনীত-কোমল হস্তদ্বারা অতি যত্নের সহিত তুলিয়া লইয়া ফেলিয়া দিল।

কালিদাস নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনে, একদিকে মাসিক পাঁচ টাকা ও আর একদিকে নগদ পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে লড়াই বাঁধিয়া গিয়াছিল। সৈন্য-সংখ্যার আধিক্যে এবং সেনা-নায়িকার দক্ষতায় পাঁচ হাজারেরই জয়লাভ হইল। অর্থাৎ ভৃত্য ফেলারামের ন্যায় বিপিনের মাও নিযুক্ত হইয়া গেল।

* * *

আরও একমাস পরে।

সেদিন কিসের ছুটী ছিল। কালিদাসের আফিস বন্ধ। একটু বেলায় কালিদাস ফেলারামকে দিয়া বাজার করিয়া ফিরিল।

ইহার কিছু পরেই সৌদামিনী কালিদাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল—“নাঃ, তোমায় নিয়ে যে আমি কি করি, কিছু বুঝে উঠতে পারচি না।”

ছুটির দিনটাতে একটু রসিকতা করিবার ইচ্ছায়

কালিদাস, মৃদু মধুর হাসিতে হাসিতে কহিল—"ওজনদরে বিক্রী কোরে দাও; মন-তিনেক ত হ'বই!"

মৃদু এবং মধুরতর হাসিতে হাসিতে সৌদামিনী কহিল—"গো-বেচারী মাল,—তিন আনা মণের বেশী কেউ দাম দেবে না; তাতে আমার শ্মশান খরচটাও কুলোবে না। সত্যি,—তোমাকে নিয়ে আমি কি করি? রোজ এই রকম বাজার থেকে ঠকে আসবে? আলু-গুলোর আদ্ধেক পচা, থোড়টা—পাকা ঝিকুড়, মাছগুলো একদম দোরসা। ঘরের পয়সা এক কাঁড়ি করে রোজ দিয়ে এই রকম অ-খাদ্য জিনিস কেউ আনে!"

কালিদাসের বুক থেকে রসের ফোয়ারা মাথায় উঠিয়া গেল। সে মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া, সুবোধ বালকের মত নীরবে রহিল।

সৌদামিনী কহিল—"ভাল মানুষ পেয়ে লোকে এই রকম রোজ ঠকাবে, এর উপায় কি! পয়সাগুলো আমাদের খোলামকুচি! কত কষ্টের পয়সা!"

কালিদাসও ভাবিল, সত্যই ত—কত কষ্টের পয়সা! তাহার মনটা সঙ্গে-সঙ্গেই খুব খারাপ হইয়া গেল।

সৌদামিনী কহিল—"বাজার-হাট করতে ওস্তাদ আমাদের ভোলা! চার আনাতে আট আনার বাজার আনবে! আর জিনিস-পত্তর আনবে কি রকম!—

একেবারে নিখুঁৎ!—নাঃ, তাকেই দেখচি এখানে আনতে হোল।"

ভোলা হইল—শ্রীভোলানাথ, সৌদামিনীর একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর। বয়স—বছর সতর। বছর চার হইল, থার্ড ক্লাসকে ইজারা লইয়া পড়িতেছে।

কালিদাস কহিল—"ভোলা বুঝি বাজার-হাট করতে ভারী—"

"ভারী ওস্তাদ। তাকে এনে এখানে রাখলে, আমার বাজারের অনেক পয়সা বাঁচবে। উঃ! কত কষ্টের পয়সা!"

সুতরাং হপ্তা-খানেকের মধ্যেই এ বাটীতে ভোলার শুভাগমন————

* * *

"এ বেলা কেমন আছ তুমি?"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আফিস হইতে আসিয়া কালিদাস সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ বেলা কেমন আছ তুমি?"

সৌদামিনী বারান্দার আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িতা থাকিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে 'সচিত্র ভারত' পড়িতেছিল, কহিল—"খুবই খারাপ। সমস্ত দুপুর বেলাটা বড্ড বেশী-বেশী বুক ধড়ফড় করেচে।"

কালিদাস বিষম চিন্তিত হইয়া পড়িল, কহিল—"তাই ত! বুক ধড়ফড়ানী রোগ ত ভাল নয়। ওতে—

"এতে হঠাৎ একদিন হার্ট ফেল্ হোতে পারে, হয়ও তাই। কিন্তু, সে ত আমার সৌভাগ্য। তোমার পায়ে মাথা রেখে যদি যেতে পারি, তার চেয়ে আমার—"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কালিদাস কহিল—"হঠাৎ এ রোগ হ'বার কারণটা কি?"

"কারণ, কথা কইবার লোক নেই বোলে। শ্বাশুড়ী কি একটা ননদ-টনদ থাকলে কি আর এমনটা হোত? তুমি সারাদিন থাক আফিসে; ভোলা থাকে স্কুলে। কা'র সঙ্গে দুটো কথা কই বল দেখি? চাকর-বাম্‌নীর সঙ্গে বোসে বোসে গল্প-গাছা করা আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

"আচ্ছা, তোমার মাকে আনালে হয় না?"

"নাঃ, থাক্। মাকে আনতে হোলে আবার বাবাকেও আন্‌তে হয়। বাবা একলাটি দেশে থাকবে কি করে? ও-সবে আর দরকার নেই। আমাদের ওখানকার বোষ্টমদের বউটার ঠিক এই দশা হোয়েছিল। বউটা শেষে একদিন মরেই গেল!"

কালিদাস মনে মনে অতি-মাত্রায় শঙ্কিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পরদিন সকালেই সে পরেশ ডাক্তারের

কাছে ছুটিল এবং সৌদামিনীর বুকের ধড়্‌ফড়ানির কথা এবং সৌদামিনী এই রোগ হওয়ার পক্ষে যাহা কারণ বলিয়াছে, তাহাও বলিল। কারণ সম্বন্ধে পরেশ ডাক্তার সৌদামিনার কথাতেই সায় দিল এবং দু'রকমের দুইখানা প্রেসক্রপসান্ লিখিয়া, নয়সিকা দামের ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া কহিল—"মাকে শীগ্‌গীর আনবার ব্যবস্থা করুন, আর এই ওষুধ দু'বেলা খাবার পর চলবে। সকালে ছোট শিশি, রাত্রে বড় শিশি। বুকের জন্যে বোধ হয় একটা মালিসও লাগবে।"

সেইদিনই শ্বশ্রুমাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য কালিদাস শ্বশুর মহাশয়কে জরুরী পত্র দিল।

ইহারই দিন আষ্টেক পরে একদিন কালিদাস আফিস হইতে আসিয়া দেখিল, ফেলারাম উঠানে একটা আড়াই-সেরী মাছ কুটিতেছে; বিপিনের মা একগাদা তরকারী কুটিয়া, সের-খানেক ময়দা লইয়া মাখিতে বসিয়াছে আর সৌদামিনী ঘরের মধ্যে বসিয়া কাহার সহিত খুব উৎসাহের সঙ্গে গল্প জমাইয়াছে। এদিকে বারান্দার আরাম-কেদারাখানায় বসিয়া তাহার শ্বশুর-মশাই ভুড়ুক্-ভুড়ুক্ তামাক খাইতেছেন আর তাঁহার সম্মুখস্থ চৌকির উপর বসিয়া ভোলানাথ তাহার সংস্কৃত পড়া মুখস্থ করিতেছে ঃ—

'শনৈঃ পন্থাঃ, শনৈঃ কন্থাঃ, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।'

কালিদাস প্রথমটা একটু থতমত খাইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ভক্তিভরে শ্বশুর মশায়কে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

শুভদিন

আজ ২৫শে কার্ত্তিক। ২৫শে কার্ত্তিক কথাটা মনে হলেই ভয়ে গা-টা কেঁপে ওঠে। ব্যাপারটা ঘটেছিল, সে বছর এই ২৫শে কার্ত্তিক রবিবারে। সে দিনের রবি কি অশুভক্ষণেই যে আমার পক্ষে উদয় হোয়েছিল। তারপর বহুদিন কেটে গেছে, তবু কথাটা মনে হলেই, মনটা আতঙ্কে শিউরে ওঠে; গা-টা ছাঁৎ কোরে ওঠে। ব্যাপারটা একটু না বললে বুঝতে পারা যাবে না। বলি—

রবিবার। ছেলেদের স্কুল নেই। সুতরাং রান্নারও তাড়া নেই। স্নানাহার সারতে বেলা একটা বেজে গেল। একটু গড়িয়ে নেবার ইচ্ছায় বাইরের ঘরের চৌকিখানার ওপর শুয়ে পড়লুম। সবে তন্দ্রা এসেচে, রাস্তার দিকের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কে ডাকলে 'দেখুন!'

সুতরাং চোখ চেয়ে দেখতে হোল। দেখলুম, মাল-

কোঁচা-পরা কাপড়, ছিটের হাফসার্ট গায়ে একটা চোদ্দ-পনর বছরের ছেলে। সম্ভবতঃ স্কুল-বয়। জিজ্ঞাসা করলাম "কি চাও ?"

"একটা টিকিট্ কিনবেন ?"

"কিসের টিকিট্ ?"

"ট্রামের অল্-ডে।" বলেই ছেলেটি খানিক থেমে আবার বলতে সুরু করলে, "সকাল বেলা কিনেছিলুম ; সব সেক্সনেই ঘুরে নিয়েছি। আপনি যদি আদ্ধেক দামে টিকিট্ খানা নেন, তা হোলে—

"শুধু-শুধু ট্রামে ঘুরে কি হবে ?"

ছেলেটি কিছু মাত্র নিরুৎসাহ না হোয়ে বল্লে, "দিনের বেলা ঘুমিয়েই বা কি হবে ? তার চেয়ে বেড়িয়ে এলে কত ভাল হয়। তিন আনা পয়সাতে আপনি সব সেক্সান্ —সব সহরটা ঘুরে আসতে পারবেন। আমি সকাল থেকে বেরিয়ে, বেয়লা, বালীগঞ্জ, বেলগেছে, টালিগঞ্জ, বাগ-বাজার, পার্কসার্কাস, কিছুই আর বাকি রাখিনি। আপনি দয়া করে———

দয়া একটু হোয়ে পড়লো ছেলেটির কথা গুলো শুনে। বেড়াবার লোভও যে একটু না হোল, তা নয়। ভাবলুম, ক'টা পয়সা দিয়ে গোটা কোলকাতাটা আজ বেড়িয়েই আসা যা'ক। বারোটা পয়সা দিয়ে

নিলুম টিকিট্ খানা। তারপর জামা কাপড় পরে বেরিয়ে পড়্‌লুম।

সে সময় যদি একটা টিক্‌টিকি পড়তো বা কেউ হেঁচে উঠতো, তাহোলে সেদিনের দুর্ভোগটা হয় ত বরাতে ঘটতো না। ভাগ্যদোষে দুটোর কোনটাই না ঘটাতে, একলাফে ফুটপাথে পড়ে ট্রাম-লাইনের অভিমুখে অগ্রসর হলাম।

বালীগঞ্জ থেকে উঠেছিলাম। কালীঘাট ডিপোয় নেমে আলিপুরের গাড়ীতে উঠ্‌লাম। মধ্যে চেঞ্জ করে পাড়ি দিলাম—বেহালা। তথা হতে আস্‌লাম এসপ্লানেড্। ভেবেছিলুম, সব শেষে যাব নিমতলাতে; কিন্তু আগেই গেলুম এবং গিয়ে ফ্যাঁসাদে পড়লুম। এমন অবস্থা হোল, যে—না পারি থাকতে, না পারি আসতে। ব্যাপারটা বলি।

ট্রাম থেকে যেমন নেমেছি, দেখি ঠিক সামনেই এক ভীষণ-দর্শন বিপুল-আয়তন ষাঁড়। আমাকে দেখেই শিং দুটো উঁচিয়ে সে ফোঁস্ কোরে তেড়ে এলো। সঙ্গে-সঙ্গেই আঁৎকে উঠে পাশের দিকে মারলুম লাফ্। ষণ্ডের শিং থেকে এড়ালুম বটে কিন্তু আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলুম। সেই জায়গাটায় ছিল কাদা। বে-টালে তারি ওপর গেলুম পড়ে। অবশ্য এদিক-ওদিক

চেয়ে উঠে পড়লাম ; কিন্তু জামা কাপড় কর্দ্দমভূষিত হ'য়ে যেরূপ দৈহিক অবস্থান্তর ঘটলো, তা'তে উঠে না প'ড়ে, নিমতলাতে চিরদিনের জন্য দেহ রক্ষা করতে পারলেই ভাল হো'ত।

একটু অন্তরালে স'রে গিয়ে খুব সতর্ক-দক্ষতার সঙ্গে কাপড় খানা ঘুরিয়ে প'রে ফেললাম, অর্থাৎ পূর্ব্বতন কোঁচাটিকে কাছা এবং কাছাটিকে কোঁচায় পরিবর্ত্তিত করলাম। কিন্তু তবুও নিমতলার কাদাকে বাগ মানাইতে পারলাম না ; দু'পাশ থেকে তাহা দিব্য স্বপ্রকাশ হোতে লাগলো। তার ওপর জামাটার ত কোন উপায়ই করতে পারলাম না।

বীডন ষ্ট্রীটের কাছেই নগেনের বাসা। মাস দুত্তিন ও-দিকে আর যেতে পারি নি। ভাবলুম, নগেনের ওখানে যাওয়া যা'ক। ওখান থেকে নগেনের একখানা ধুতি আর একটা জামা চেয়ে নিয়ে, তা'ই পরা যাবে, আর এ গুলো একখানা কাগজে জড়িয়ে নিলেই চলবে এখন।

নগেনের বাসার সামনে এসে দেখলুম, বাহিরের ঘরের দরজাটি খোলা হাঁ-হাঁ করছে। কেউ ইচ্ছে করলে, স্বচ্ছন্দে ঢুকে কিছু জিনিষ-পত্র নিয়ে বে-মালুম স'রে পড়তে পারে। নগেনটা চিরকালই এই রকম

আলগা। ঘরের মধ্যে ঢুকে নগেনকে ডাকতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ডাকলুম না। ভাবলুম, একটু জব্দ করা যা'ক। টেবিলের ওপর ছিল—একটি রিষ্ট-ওয়াচ আর ফাউন্টেন পেন। টপ্ করে দুটোই পকেট্-জাত করে ফেল্লাম। দেওয়ালে একটা পাঞ্জাবী ঝুলছিলো, তার বোতাম চারটে খুব সম্ভব সোনারই হ'বে। নগেনের ওপর খুব রাগ হোতে লাগলো। রাস্তার ধারের ঘর, এইভাবে কখনো খুলে রাখতে হয়! একটা বিষয়ে কিন্তু তা'র ওপর মনটা খুব সন্তুষ্ট হোল। ওর কোন সখ-টক ছিল না। বৈঠকখানাটা রেখেছিল গোয়াল ঘর ক'রে। কিন্তু এবার দেখলুম, রুচিটার বেশ-কিছু পরিবর্ত্তন হোয়েচে। টেবিল, চেয়ার, কৌচ, আয়না, ছবি প্রভৃতিতে দিব্য সাজিয়ে ফেলেচে। তা' সাজাক, কিন্তু ঘর খোলা রেখে, সোনার বোতামশুদ্ধ জামা এইভাবে কখনো কেউ রাখে! বোতাম ক'টা খুলতে লাগলুম।

হঠাৎ পিছন থেকে নগেন এসে ভীষণভাবে জাপটে ধরলো। তারপরই পিঠে পড়লো একটা প্রচণ্ড ঢাকাই কীল। ফিরে দেখি, নগেন নয়। দেখলুম—: না, আর দেখলুম না। গালে বেশ ভারি গোছের একটা চড় খেয়ে—হ্যাঁ, দেখলুম বৈ কি—দেখলুম, শুধু ধোঁয়া আর সর্ষে ফুল!

লোকটা চেঁচিয়ে ডাকলে—"শিবু, শীগ্‌গির আয়, থানায় ছুটে গিয়ে খবর দে। এক ব্যাটা চোর ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন—

চক্ষের নিমেষে শিবু ছুটে এল এবং এসেই আমার পিঠে মারলে—কীল নয়—একটা প্রচণ্ড 'বক্সারা' ঘুসি।

মুহূর্ত্তের মধ্যে খোলা দরজার সামনে রাস্তায় দু'দশজনের ভীড় জমে উঠ্‌ল।

কেউ বল্লে—"বেশ বাবু-চোর ত!"

কেউ বল্লে—"চোর বলতে নেই; সাধু লোক। দেখচ না, ভক্তিভরে কোথায় কাদার ওপর গড়া-গড়ি খেয়েছেন!"

একটা বাব্‌রী-ওলা ছোকরা পরামর্শ দিলে—“থানায় খবর দাও, য়্যারেষ্ট্ কোরে নিয়ে যা'ক রাস্কেলকে !”

আমি ঠিক সজীব ছিলাম, কি নির্জীব ছিলাম, বল্‌তে পারি না। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা কিছুই বোধগম্য হল না। একটু ধাতস্থ হবার পর বুঝলুম যে, নগেন এ বাসা ছেড়ে চলে গেছে এবং অন্য লোক ভাড়া নিয়ে আছে।

মাথাটা ঘুরছিলো। মেজের ওপর বসে পড়লুম; কারণ ঘুসি চড় ছাড়া, দুচারটে খুচরা গরম চাঁটিও মাথায় বেশ দু-পাঁচ ঘা পড়ছিল।

কতক্ষণ যে বে-হুঁসের মত বসেছিলুম আর সে অবস্থায় নগেনের নাম-টাম কিছু করেছিলুম কি না, বলতে পারিনা। যখন হুঁস্ হোল, দেখলুম—নগেন সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একজন হাত-পাখা দিয়ে আমায় জোরে জোরে হাওয়া দিচ্ছে। বুঝলুম, এই পাড়ারই অন্য কোন বাড়ীতে নগেন আছে।

সেই ‘বক্সার’ শিবু, নগেনের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল—“প্রথমে যদি উনি আপনার নামটা করতেন, তা হোলে আর এই কাণ্ডটা হোত না। ছিঃ ছিঃ! লজ্জায় আমাদের যে কী হচ্চে তা আর বলবার নয়।”

কিন্তু, লজ্জা তাদের না আমার ?

তবে—লজ্জা-লাঞ্ছনার কোন অনুভূতিই তখন আর আমার ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল, নিমতলার ষাঁড় যদি শিং দিয়ে পেট চিরে ফেলে সেই খানেই চিরদিনের মত শুইয়ে রাখতো আমাকে! থেকে থেকে নগেনের ওপর রাগটাও মনের মধ্যে ঠেলে আসছিল। আমারই ওপর শত্রুতা সাধবার জন্যেই সে এতদিন পরে টপ্ করে বাসা বদল করলে! ষ্টুপিডের কাছে আমারই বা আসবার কি প্রয়োজন ছিল? অবশ্য স্বীকার করি, প্রয়োজন ছিল বটে। আসল কথা, আছাড় খাওয়াটাই অন্যায় হোয়েচে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায় যা হবার তা ত হোয়েচে, ও সব নিয়ে চিন্তা করা এখন বৃথা। সুতরাং চুপ করে বসেই রইলুম। ওঠবার ক্ষমতাও ছিল না; কারণ মাথার ওপরকার বাতাস যেন বিশ-মনী পাথর হোয়ে আমাকে চেপে রেখেছিল।

তারপর কি হোল, কি করলুম, সে সব আর না-ই বা বললুম। তবে একটা কথা বলা দরকার যে, ২৫শে কার্ত্তিকের দিনটি চিরকাল আমার মনে থাকবে। অমন শুভদিন জীবনে আমার কখনো আসে নাই; বোধ হয় আসবেও না।

ক্রমে ক্রমে

খাঁটী ৪৯ বৎসর ৭ মাস বয়সে পুলিসের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, শ্রীযুক্ত নসীরাম সান্ন্যাল, তাঁহার সঞ্চিত বেতন, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, পুরস্কার এবং ইত্যাদি বাবদ মোট ৭১,৭৫৯৸/৩ পাই নগদ, সরকার-প্রদত্ত 'রায়-সাহেব' খেতাব, এবং বিশ বছরের ভৃত্য বিষ্টুচরণকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং বৌবাজারে জ্ঞাতি-ভ্রাতা হরেকৃষ্ণের বাসায় অধিষ্ঠান করিলেন।

হরেকৃষ্ণ কহিল—"এইবার ত দাদা, বৌ-দিদিকে তা'হোলে আনতে হয়।"

নসীরাম চা পানের পর গড়গড়ায় ধূমপান করিতে-ছিলেন। সুখ-টান্; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারিলেন না। একমুখ ধোঁয়া ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"আনতে ত হবেই। তবে এ ক'টা দিন বাদে সামনেই চোত্ মাস পোড়চে; কাজেই সেই বোশেখ না হোলে আর আনা ঘটে উঠবে না।"

হরেকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ সভয়ে একটু ঢোঁক গিলিয়া কহিল—"এ-মাসেরও ত এখনো পাঁচ-সাত দিন রয়েচে দাদা, এর ভেতর ত অনায়াসেই—"

হরেকৃষ্ণের মনোভাব যেন ইঙ্গিতে নসীরাম বুঝিয়া লইলেন। মৃদু এবং মোলায়েম ভাবে হাসিতে-হাসিতে কহিলেন—"ভায়ার বোধ হয় ভয় হচ্ছে যে, দাদার এই বিপুল দেহ-ভার এ-বছরের মধ্যে এখান থেকে আর অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে না। সে-সব কোন ভয় নেই, কেষ্ট। দু'চার দিনের মধ্যেই একটা বাসা-টাসা ঠিক কোরে ফেলচি।"

হরেকেষ্ট অত্যন্ত সাহস দেখাইয়া কহিল—"সে-সব কোন ভয়ের জন্য বলিনি দাদা; আপনি আমার এখানে ছ'মাস ধরে থাকুন না কেন—সে ত আমার সৌভাগ্য। তা'—আপনি বাসা ঠিক করার কথা বলচেন কেন? আপনার নিজের বাড়ী?"

"নিজের বাড়ী? তাতে ত এক ভদ্রলোক ভাড়া আছেন। হঠাৎ তাঁকে তুলে দেওয়াটা অনুচিত হবে না কি?" ভুড়ুক-ভুড়ুক করিয়া শ্রীযুক্ত নসীরাম কখনো মুদিত নেত্রে, কখনো চক্ষু চাহিয়া গড়গড়া টানিয়া যাইতে লাগিলেন। আর হরেকৃষ্ণ কিছু বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কবে হইতে তাহার দাদার এই উচিত-অনুচিতের বিচার-বৃত্তি তাঁহার অন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপ পুষ্টিলাভ করিল।

ভৃত্য বিষ্টুচরণ একপাশে বসিয়া প্রভুর একটা ছেঁড়া-

পাঞ্জাবীতে তালি লাগাইতেছিল। হরেকৃষ্ণ উঠিয়া গেলে নসীরাম তাহার উদ্দেশ্যে কহিলেন—"বিদ্যেতে সব কাঁচকলা আর কি! হ্যাঁ রে বেষ্টা বাড়ীটা থেকে মাসে ৭০টা কোরে টাকা ভাড়া উঠছে; আমি বাড়ীটা দখল ক'রে সেইটে নষ্ট করি! আমাদের ২।৩ জন থাকবার মত ছোট-খাটো একটা বাড়ী টাকা ২৫।৩০এর মধ্যে ভাড়া কোরে থাকলেই চলবে। তার জন্যে, অর্থাৎ যেস্থানে ২৫।৩০ টাকায় কাজ হবে, সেখানে ৭০টা কোরে টাকা খরচ করি কেন? কি যে বুদ্ধি!"

বিষ্টু কহিল—"এঁনাদের বুদ্ধি আর আপনার বুদ্ধি, বাবু, তফাত হোল আকাশ আর পাতাল! যাকে বলে সগ্গো আর নরোক! আপনার মত সুরুখ্খু বুদ্ধি কটা মনিষ্যির আছে বাবু!"

"হ্যাঁ রে, বেষ্টা!"

"বাবু!"

"নতুন কল্কে কিনে এনেচো, ভাল কোরে দেখে আনো-নি বাপধন! ছ্যাঁদাগুলো মস্তো বড় বড়; হু-হু কোরে তামাক পুড়ে যাচ্চে আর গল্-গল্ কোরে ধোঁয়া বেরুচ্চে।"

"ওর চেয়ে আর ছোট ছ্যাঁদা পেলুম না, বাবা।"

"এক কাজ কোরো। দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার

পর, একটু এঁটেল মাটি লেপে, ছ্যাঁদাগুলোর ফাঁদ ছোট কোরে নিও।”

বৈকালের দিকে রায়সাহেব সকালের সেই তালি-মারা পাঞ্জাবীর উপর বহু কালের জীর্ণ এবং বিবর্ণ মট্‌কার চাদরখানা ফেলিয়া, মোটা লাঠিগাছটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য—ভ্রমণ এবং ভাড়াটে বাড়ীর সন্ধান করা।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে ঘুরিয়া বহু ‘টু-লেট্’ তিনি আবিষ্কার করিলেন বটে, কিন্তু পছন্দসই বাড়ী পাইলেন না। হয়—ভাড়া বেশী, নয়—নানা অসুবিধা। বৈঠকখানা লেনে একটা বাড়ী তাঁহার পছন্দ হইল বটে, কিন্তু সে বাড়ীতে থাকিতে তাহার জবরদস্ত পুলিশ-হৃদয়ও একটু যেন বিচলিত হইয়া উঠিল। বাড়ীটি দ্বিতল। উপরে বাড়ীওয়ালা থাকেন, নীচের পার্ট খালি। বাড়ী-ওয়ালার পরিজন-সংখ্যাও কম। স্বামী-স্ত্রী এবং একটি ২৩।২৪ বছরের ছেলে। কিন্তু ওই ‘একশ্চন্দ্রই—তমোহন্তি’। যে মিনিট-পনের রায়সাহেব নীচের দালানে দাঁড়াইয়া বাড়ী-ওয়ালার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তাহারই ভিতর সেই ঝাঁকড়া-চুল, লুঙ্গী-পড়া গলায় মালার আকারে পৈতা-ঝোলানো ছেলেটি অন্ততঃ বার-দশেক দেহ দোলাইয়া, মাথা নাড়িয়া এবং হাতে তুড়ি দিয়া গান

গাহিতে গাহিতে তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া অদ্ভুত ভঙ্গীতে আসিয়াছে এবং গিয়াছে। তাহার সেই গানের কলিটি ছিল—'কে তুমি স্বপন-রাণী এলে মোর হৃদয়-তলে।'

রায়সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছেলেটির বিবাহ দিয়েচেন কি ?

"চেষ্টা-চরিত্র, দেখা-শুনো চলচে।"

সেই সময় ছেলেটি আর একবার ট'ল দিয়া গেল। মুখে তাহার ঐ 'কে তুমি স্বপন-রাণী' এবং হাতে—তুড়ি।

রায়সাহেব তাহার আ-পাদ-মস্তক দেখিতে দেখিতে প্রস্থানোদ্যত হইলে, বাড়ীওয়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ী পছন্দ হোল আপনার ?"

লাঠি-গাছটায় ভর দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া রায়সাহেব মৃদু-মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"বাড়ীর চেয়ে আপনার ছেলেটিকেই বেশী পছন্দ হোল। কিন্তু ভয় হচ্চে।"

"ভয়টা কিসের ?"

"স্বপন-রাণীকে স্বপ্ন দেখে হয় ত কোন দিন তেড়ে এসে আঁচড়িয়ে কাম্‌ড়িয়ে দিতে পারে।" প্রত্যুত্তরে বাড়ীওয়ালা কিছু-একটা গরম-গরম নরম-নরম বলিয়াছিল, কিন্তু রায়সাহেব তখন 'রেঞ্জের' বাইরে, সুতরাং তাহা আর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবার অবসর পাইল না।

যাহা হউক, প্রভু এবং ভৃত্য—রায়সাহেব এবং বিষ্টুচরণ—উভয়ের অনুসন্ধানের ফলে, নেবুতলায় ৩২ টাকা ভাড়ায় একটি বাটীর একাংশ পাওয়া গেল এবং দুই-চারি দিনের মধ্যেই হরেকৃষ্ণকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আপ্যায়িত করিয়া রায়সাহেব তাঁহার নূতন বাসায় উঠিয়া আসিলেন। উভয়ের আহারের বন্দোবস্ত হইল—বড় রাস্তার মোড়ে 'মডেল ভোজনালয়'-এ। রায়সাহেব বলিলেন—"বিষ্টু, চোত্ মাসটা এই রকমেই কাটুক্। একটা মাসের জন্যে আর বামুন-টামুনের হাঙ্গামা কোরে কি হবে। তার মাইনেও গুণতে হবে, অথচ চুরি কোরে ভুত ভাগাবে। কি বলিস ?"

"আজ্ঞে, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই হবে। এ মাসটা কাট্‌লেই ত মা-জননী আমার—

"হ্যাঁ, এসে পড়্চে ; সুতরাং—"

সুতরাং এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। রায়সাহেব সকালে নিকটস্থ চা-এর দোকান হইতে চা খাইয়া আসেন। বাড়ীতে আসিয়া স্বল্পছিদ্রযুক্ত কলিকাতে তামাক খান। তাহার পর বিষ্টুচরণ একবাটি তৈল লইয়া প্রথমে তাঁহার ভুঁড়ি এবং তৎপরে তাঁহার স্থূল শরীরের সর্ব্বাংশ উত্তমরূপে তৈল-লেপন এবং মর্দ্দন করিয়া দিলে তিনি স্নান সমাপন করতঃ—'মডেল' হইতে

খাইয়া আসেন এবং মেজেয়-পাতা মাতুরের উপর তাকিয়ায় ভর করিয়া দেহ ঢালিয়া দেন। বৈকালে এক-এক দিন এক-এক দিকে বেড়াইতে বাহির হ'ন :—কোন দিন পার্কে, কোন দিন বেলেঘাটার খাল-ধারে, কোন দিন বা পথে-পথে। এক দিন রায়সাহেব একটু লম্বা পাড়ি দিয়া, বালীগঞ্জ 'লেকে' বেড়াইতে আসিয়া আচম্বিতে মন খারাপ করিয়া বসিলেন।

বসন্ত কাল। শেষ চৈত্র। 'লেকে'র বাগানে প্রচুর ফুল ফুটিয়াছে। মন্দ মন্দ দক্ষিণা বাতাস গায়ের উপর পড়িয়া সোহাগে প্রাণ-মন নাচাইয়া তুলিতেছে। অদূরের কোন-এক গাছের উপর হইতে একটা কোকিল ক্রমাগত নষ্টামী করিতেছে। রায়সাহেব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। বিষ্টুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ চোত মাসের কত তারিখ হ'ল রে ?"

"১৭ই বাবু।"

"১৭ই কি রে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু ; পরশু ১৫ই গেছে, কাল ১৬ই, আজ ১৭ই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রায়সাহেব পাশ ফিরিয়া পড়িয়া রহিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি কখন কড়ি-কাঠে, কখন দ্বার-জানলার চৌকাঠে।

২

শ্রীমতী ভ্রমরবালা আসিয়াছে। অর্থাৎ রায়সাহেবের স্ত্রী তাহার পিত্রালয় শান্তিপুর হইতে কলিকাতার নূতন বাসায় আসিয়াছে। আসিয়াই আবার ধূলাপায়ে শান্তিপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য জেদ ধরিয়াছিল। এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাড়াটিয়া বাসায় ভ্রমরবালা কিছুতেই থাকিতে রাজী নহে। রায়সাহেব অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, অনেক প্রকারে বুঝাইয়া, তবে ভ্রমরকে শান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তা' হইলেও ভ্রমর-গুঞ্জন একেবারে স্তব্ধ হয় নাই।

রায়সাহেব কহিলেন—"বুঝিছি ভোমর, এক জন রায়সায়েবের স্ত্রী হোয়ে ছোট-খাট এই রকম সামান্য বাসায় থাকাটা একটু লজ্জা-লজ্জা করে আর কি।"

ভ্রমর গুন্-গুন্ করিয়া উঠিল—"রায়সাহেবের স্ত্রী বোলে নয়, এক জন হাকিমের মেয়েও ত বটে! আমার চোদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ কখনো এ-রকম বাড়ীতে থাকে-নি।"

রায়সাহেব হি-হি করিয়া হাসিয়া কহিলেন—"থাকো নি? মেদিনীপুরের বাসার কথা বুঝি ভুলে গেলে?

রামপুরহাটের বাসা? মেমারীর সেই রাজপ্রাসাদের কথা না হয় না-ই বললুম, কিন্তু উলুবেড়ের বাসার কথাটা ত মনে আছে?”

“তোমাকে বোঝানো আমার সাধ্য নয়। সে সব মফঃস্বলের কথা ধরো কেন? মফঃস্বলে বাধ্য হোয়ে থাক্‌তে হয়। তা'ও থেকেচি—তোমার সঙ্গেই। কিন্তু বাবাও ত মুন্সেফ ছিলেন; সাত জায়গায় তাঁকে বাসা কোরে থাকতে হোত। কিন্তু তোমার বাসার মত ওঁচা বাসা কই কোথাও ত তাঁর ছিল না! আর তা ছাড়া, এখানে যখন নিজেদের বাড়ী রোয়েচে, তখন—”

“আহা-হা, তাই হবে গো, তাই হবে। এ মাসটা কোন রকমে—। আমি যা ব্যবস্থা করেছিলুম, পাকা ব্যবস্থা। বাড়ীটা থেকে মাসে ৭০টা কোরে টাকা আসচে। নিজেরা এই দুটো প্রাণী—অত বড় বাড়ীটা থেকে অত-গুলো কোরে টাকা লোকসান্ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ?”

“তার চেয়ে কাশী চলো না, খুব বেশী বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেখানে পাঁচ সিকেতে একখানা ঘর পাওয়া যাবে'খন। আর খাবার খরচ মোটেই লাগবে না; দু'জনে হাত-ধরাধরি কোরে কোন-একটা ছত্রে গিয়ে রোজ বসলেই হবে। গভর্ণমেণ্ট তোমাকে রায়-সাহেবী

না দিয়ে বরঞ্চ আমাদের বেষ্টাকে যদি দিত ত মানাতো! ছিঃ—ছিঃ—এমন কিরেট্——”

“ভোমর, আমাকে তুমি বুঝতে পার নি; আমি মোটেই কিরেট্ নই।”

“না, তুমি মস্ত বড় খোরচে; একেবারে দাতাকন্ন!”

“একহিসেবে তাই বটে। তোমার কথার হিসেবেই বুঝিয়ে দি। যারা খুব এলো-পাতাড়ী খরচ করচে আর দু’হাত দিয়ে দান করচে, পরজন্মে কড়ায়-গণ্ডায় সব আবার বুঝে পাবে। আর আমি যদিই ধরো কিরেট্-ই হই, তা হোলে ত পরজন্মে আর একটা কাণা কড়িও পাব না! তার মানে, সব খরচ-খরচা কোরে, দান কোরেই চোলে গেলুম। নয় কি না বল?”

ভ্রমর অবাক হইয়া রায়সাহেবের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর কহিল—“বেষ্টা যে বলে, ‘বাবুর আমাদের সুরুখ্‌খু বুদ্ধি’—কথাটা ঠিকই। তা ও-সব বাজে কথা থাক্, এ-বাড়ীতে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।”

অগত্যা রায়সাহেবকে তাঁর পাকা হিসাব কাঁচাইতে হইল, দিন-পনর পরেই তিনি তাঁহার শ্যামবাজারের আপন বাড়ীতে ভ্রমরকে লইয়া উঠিলেন। যিনি ভাড়াটীয়া ছিলেন, তিনি শান্তপ্রকৃতির লোক। তা

ছাড়া দেখিলেন, বাড়ীর মালিক যিনি, তিনি একে পুলিসের কর্ম্মচারী, তাহার উপর—রায়সাহেব। সর্ব্বোপরি তাঁর বিপুল বপুখানিও তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়। সুতরাং রায়সাহেব তাঁহাকে উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেই, তিনি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, দুই-চার দিনের মধ্যেই অন্যত্র বাড়ী ঠিক করিয়া উঠিয়া গেলেন।

শ্যামবাজারের বাড়ীতে গিয়া ভ্রমর যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার মুখে প্রফুল্লতা এবং হাসি দেখা দিল। রায়সাহেব বলিলেন—"তোমার মুখে হাসি দেখবার জন্যেই আমার সব, ভোমর। তোমাকে ভালবেসেই সুখ, আদর কোরেই তৃপ্তি।"

ভ্রমর জাঁতি লইয়া সুপারি কাটিতেছিল; কহিল—"ওই নাটকখানা বুঝি দুপুর বেলা পড়েছ?"

"দেখ, সংসারে ন মাতা, ন পিতা, ন পুত্র, ন পরিজন; তুমিই আমার হৃদয়-কাননের একমাত্র—"

"জাঁতিতে এক্ষুনি হাত কেটে ফেলবো, চুপ করো।"

সুতরাং রায়সাহেব চুপ করিলেন এবং নূতন দিয়াশলাইয়ের বাক্স ও ছুরিখানা লইয়া তাহার প্রত্যেকটি কাঠি বারুদ সমেত লম্বালম্বি চিরিতে বসিলেন।

রায়সাহেবকে লুকাইয়া ভ্রমরবালা একটু হাসিল; জিজ্ঞাসা করিল—"একটা কাঠি চিরে ক'টা ক'রচ?"

"কোনটাকে দু'টো, কোনটাকে তিনটে।"

"যাক,—বাড়ীর দরুণ লোকসানটা দেশলাইয়ের কাঠির দৌলতেই পুষিয়ে গেল।"

"কি রকম ?"

"অর্থাৎ বাড়ীভাড়া বাবত ৭০টা কোরে টাকা যেমন কমলো, তেমনি ৪০টা কাঠির দামে একশোটা কোরে কাঠি আসতে লাগলো। বড় সোজা কথা নয়! এক গুণের দাম দিয়ে আড়াই গুণ পাওয়া। অর্থাৎ এক হাজারে আড়াই হাজার, এক লাখে আড়াই লাখ ;— টাকাতেই ধরো, আর জিনিষেই ধরো।"

হি-হি করিয়া হাসিয়া রায়সাহেব কহিলেন—"হিসেবে দেখচি তুমি একেবারে একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেল।"

"দুঃখু করো না, তোমাকেও শিখিয়ে নোব। এত দিন ত নিতুম। ২৫ বছর ধোরে খালি চোর-ডাকাতের পেছনে-পেছনে ছুটেছ, শিখিয়ে নেবার অবসর পাইনি। এইবার নিতেই হবে।"—বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রমর মুখ ও চোখের যে এক অপরূপ ভঙ্গী করিল, তাহাতে রায়সাহেব যদি বসিয়া না থাকিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইতেন এবং দাঁড়াইয়া না থাকিয়া যদি শুইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ঘুমাইয়া পড়িয়া নাক ডাকাইতেন। সুতরাং

সে-রকম কোন পড়া না পড়িয়া,—যেন কেমন-এক-রকম হইয়া পড়িলেন। ছুরিখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িল, এবং দেশলাইয়ের কর্ত্তিত সূক্ষ্ম কাঠিগুলি বাতাসে এদিক্ ওদিক্ ছড়াইয়া পড়িল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রায়সাহেব অনিমেষ দৃষ্টিতে ভ্রমরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বিহ্বল স্বরে কহিলেন—"ভো—ভোমর!"

তেমনি মধুর অপরূপ মুখভঙ্গী সহকারে ভ্রমর কহিল—"কি হুকুম, বলো। চোখ দিয়ে একদৃষ্টিতে তুমি যে আমায় গিলতে সুরু ক'রে দিয়েছ!"

"আচ্ছা ভোমর, বয়স তোমার যত বাড়চে, রূপও কি ততই বাড়চে?"

উঠিয়া আসিয়া ভ্রমর রায়সাহেবের কানের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল—'রূপ বাড়ে-নি গো, বেড়েছে তোমার—ভালবাসা।"

ভ্রমর ঘরের ভিতর হইতে পাণের বাটা আনিয়া পাণ সাজিতে বসিল। রায়সাহেবের প্রসন্ন দৃষ্টি সমভাবেই ভ্রমরের মুখের উপর আবদ্ধ। নিজের মনে তিনি কহিলেন,—"পরিপূর্ণ—ভরা নদী! প্রথম-জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস এ সৌন্দর্য্য পাবে কোথা!"

"তোমার ভাব লেগেচে; ঠিকই ভাব লেগেচে!

একটু বেশী কোরে চুণ দিয়ে একটা পাণ সেজে দি, খাও ; ভাব-লাগা সেরে যাবে।” বলিয়া ভ্রমর একটা সাজা-পাণ রায়সাহেবের মুখের মধ্যে আদরে ও সোহাগে গুঁজিয়া দিল।

রায়সাহেব গভীর তৃপ্তিতে পাণ চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন,—“ভোমর, তোমায় আমি তু'টো বর দেব, কি চাও বল।”

হাসিতে হাসিতে ভ্রমর কহিল—“আমার ত একটা ছেলে নেই যে, তাকে রাজ-সিংহাসনে বসাতে বোল্‌বো। আর সতীন-পোও নেই যে, তাকে বনবাসে পাঠাতে বোল্‌বো।”

“সত্যি বলচি ভোমর, তুমি কি চাও বল—আমি দেবো।”

“ঠিকই দেবে ?”

“ঠিকই।”

“সত্যি-ই-ই ?”

‘সত্যি।”

“তা হোলে এই দাও যে, তোমাকে যে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, তা বাসতে দিও।

প্রবল আনন্দের স্রোতকে সামলাইয়া লইয়া রায়-সাহেব কহিলেন—“এ ত গেল একটা ; আর একটা ?”

"আর একটা ? বোলবো ? ঠিক দেবে ত ?"

"ঠিক দোবো।"

সহাস্য মুখে, দুই হাত দিয়া রায়সাহেবের গলা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার মুখখানাকে নিজের মুখের কাছে আনিয়া ভ্রমর কাণে কাণে কি বলিল। রায়সাহেব কহিলেন "দোবো ভোমর, ঠিকই দোবো। তোমার জন্যেই আমার সব। এই মাসের মধ্যেই আমি তোমাকে মোটর এক খানা কিনে দোবো।

ভ্রমর চায়ের জন্য ষ্টোভ ধরাইতে উঠিয়া গেল।

৩

মোটর কেনা হইয়াছে। সুন্দর একখানি মোটর ভ্রমরই পছন্দ করিয়া লইয়াছে।

রাস্তার দিকে খানিকটা ফাঁকা জমী পড়িয়াছিল, তাহারি এক পার্শ্বে গ্যারেজ প্রস্তুত হইয়াছে।

সকালে রায়সাহেব বিষ্টুকে লইয়া বাজারে গেলে, রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে ভ্রমরের বহুক্ষণ ধরিয়া চুপি চুপি কি-সব কথা-বার্ত্তা এবং পরামর্শ হইল। রায়সাহেব বাজার হইতে ফিরিয়া আসিলে, রাজমিস্ত্রী কহিল "একধারে গ্যারেজ বানালে, রাস্তার টানে বরাবর রেলিং বসিয়ে ফটক না করলে, বাড়ীর খোল্তাই হবে না বাবু।

রায়সাহেব কথাটাকে আমলই দিলেন না। বলিলেন "খোলতাই-এর আর দরকার নেই, কাজ চল্লেই হোল।"

ভ্রমর দেখিল, কোন-কিছু প্রস্তাবের পক্ষে উপযুক্ত সময় এখন নয়। সকালে ভ্রমর মাথা ঘসিয়াছিল। বৈকালে সেই হাল্‌কা, ঝর্‌-ঝরে, পরিচ্ছন্ন কেশদামে সামান্য কিছু গন্ধ-তৈল মাখাইয়া, বহুকাল পরে ভ্রমর অতি সূক্ষ্ম সোনালী-জরি দিয়া সযত্নে বেণী রচনা করিয়া পৃষ্ঠে দোলাইয়া দিল। তাহার পর সাবান দিয়া গা ধুইয়া আসিয়া একখানা সুদৃশ্য চেক্‌-নীলাম্বরী সাড়ী বাহির করিয়া পরিল। কপালে একটি ভাটিয়া-টিপ এবং পায়ে আল্‌তা লাগাইল। পুরাতন কাণের টপ দুইটি খুলিয়া তৎস্থানে পিতৃদত্ত পান্নার দুল দুইটি দোলাইল। সাজ-সজ্জা শেষ করিয়া আরসীর সামনে দাঁড়াইয়া ভ্রমর নানাভাবে একবার নিজেকে দেখিয়া লইল। তাহার পর ষ্টোভ জ্বালাইয়া চা প্রস্তুত করিয়া চায়ের বাটি-হাতে রায়সায়েবের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, তিনি নিমীলিত-নেত্রে অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় তাকিয়ায় দেহভার ন্যস্ত করিয়া কথঞ্চিৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন।

মেজের উপর চায়ের বাটি রাখিয়া, স্বামীর সম্মুখে হাঁটু-গাড়িয়া বসিয়া ভ্রমর তাঁহার কাঁধ দুইটিতে মৃদু নাড়া দিয়া কহিল—"ঘুমুচ্চ! চা এনেছি যে।"

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া-পড়িয়া রায়সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন। ভ্রমরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এ কি! আজ এ কি রূপ!"

"আজ নব রূপ। চা-টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে।" বলিয়া ভ্রমর চায়ের কাপটা রায়সাহেবের হাতে তুলিয়া দিল।

হাতের চা রায়সাহেবের হাতেই রহিল; কহিলেন—"এ-বয়সে এ-রকম সাজ সকলকে মানায় না, কিন্তু তোমাকে যে কত সুন্দর দেখাচ্ছে ভোমর, তা আর কি বোলবো!"

"পরে বোলো এখন; চা-টা আগে খেয়ে নাও; আমি তামাক সেজে আনি।"

ব্যস্ত হইয়া রায়সাহেব বলিলেন—"কর কি! এই রূপ নিয়ে তুমি সাজবে তামাক। বেষ্টাকে সাজতে বলো।"

"তোমার তামাক সাজতে পেলে, এ রূপ আমার সার্থক হবে"—বলিয়া ভ্রমর বাহির হইয়া গেল, ও কিছু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ফুঁ দেওয়ার ফলে ভ্রমরের মুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল এবং সেই মুখের উপর আগুনের আভা আসিয়া পড়িতে লাগিল।

রায়সাহেব বলিলেন—"কি সুন্দর, ভোমর, কি সুন্দর!

এটা যদি রাতের অন্ধকারে হোত, তা হ'লে এ-সৌন্দর্য্য হাজার গুণ ফুটে উঠ্‌তো।"

গড়গড়ার উপর কলিকাটা বসাইয়া দিয়া ভ্রমর কহিল —"চাকরী ছেড়ে দিয়ে তোমার দেখছি মাথার দোষ ঘট্‌বার উপক্রম হ'ল !"

"তুমি বোসো ভোমর, বোসো ; এখন ত আর কোন কাজ নেই। আমার কাছে খানিক বোসে থাকো।"

"দাঁড়াও, বসচি"—বলিয়া ভ্রমর বাহির হইয়া গেল এবং ও-ঘর হইতে একটা মলিন ছেঁড়া ব্লাউজ হাতে করিয়া আনিয়া রায়সাহেবের সম্মুখে আসিয়া বসিল ; কহিল—"তুমি তামাক খাও, আমি বোসে বোসে এইটে সেলাই কোরে ফেলি।"

"কি ওটা ?"

"একটা পুরোণো ব্লাউজ। পিঠের দিক্‌টায় ছিঁড়ে গেছে। সেলাই কোরে গায়ে দোবো।"

"তোমার এই সাজ-সজ্জার সঙ্গে ঐ ছেঁড়া ব্লাউজ !"

"তাতে কি ; কাজ চোল্লেই হ'ল। অমন সুন্দর মোটর-গাড়ী যদি এই অ-ভব্য বাড়ীতে বে-মানান্ না হয়, তা হ'লে এই সাজ-সজ্জার সঙ্গে এ-ও বে-মানান্ হবে না।"

রায়সাহেব হাঁ করিয়া ভ্রমরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভ্রমর কহিল—"তোমার পেট্‌টা মোটা হ'বার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও কিঞ্চিৎ মোটা হয়েচে। বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে ভোঁতা হ'য়ে আসচে; একটু শাণ দিয়ে না নিলে আর চ'লচে না।"

"তোমার প্রেমের শাণ-চক্রেই ত আমার কায়-মন-প্রাণ"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, রসিকতাটা বেশ গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াও রায়সাহেব আর শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না; শুধু হিঃ-হি শব্দে খানিক হাস্যরস ঢালিয়া কহিলেন—"তা হ'লে আমায় নিয়ে তোমার মুস্কিল হ'লো দেখচি; হ্যাগা ভ্রমরবালা?"

"মুস্কিল কিছুই নয়। একটু পড়িয়ে-শুনিয়ে নিতে হবে আর কি। কষ্ট কোরে আমাকে দিন-কতক মাষ্টারী কোরতে হবে।"

"তাই করো।"

"দাঁড়াও, বেত্‌ আনি"—বলিয়া ভ্রমর বিছানা হইতে হাত-পাখাটা তুলিয়া লইয়া কহিল—"আপাততঃ বেতের বদলে পাখার বাঁটের দ্বারাই কাজ চ'ল্‌তে থাকুক।"

রায়সাহেব তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্দ্ধশয়ন অবস্থায় গড়গড়ার নল টানিতেছিলেন আর দারুণ গ্রীষ্মজনিত উত্তাপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিতেছিল। ভ্রমর

সম্মুখে বসিয়া পাখার দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে মাষ্টারী সুরু করিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া বাতাস করিতে করিতে ভ্রমর পাঠদান করিল আর ছাত্র তামাক টানিতে টানিতে পাঠগ্রহণ করিল। এই পাঠদান ও পাঠগ্রহণের ফলে ইহাই স্থির হইল যে, রাস্তার টানে বরাবর রেলিং বসানো হইবে, মধ্যে লোহার ফটক হইবে। বাহিরের দিকের জানালা-দরজাগুলি বেশীর ভাগই খুলিয়া ফেলিয়া হাল-ফ্যাসানের লাগাইতে হইবে; উপর ও নীচের দালানে মার্ব্বেল পাথর দেওয়া হইবে; এ-সব ছাড়া তেতলায় এক কোণে রাস্তার দিকে একটা ছোট গোলাকার ঘর তৈয়ার হইবে, যাহার মাথাটা হইবে গম্বুজের মত গোল। বলা বাহুল্য যে, সমস্ত কাজের পর, সমস্ত বাড়ী চুণ-কাম ও রং-কাম হইবে।

ভ্রমর বলিল—"বাইরের দেওয়ালে কি রং দেবে? সাদা চুণকাম?"

রায়সাহেব কহিলেন—"না না, গোলাপী কি হলদে।"

"রাম-রাম! বাইরেটায় সব সবুজ রং হবে।"

জোড়-হাতে বিষ্টুচরণ আসিয়া কহিল—"মা!"

ভ্রমর কহিল—"কি রে বিষ্টু?"

"বলচি কি মা, এমন রাজ-পরিসদ্ বাড়ী হবে, ফটকে

বাবুর নাম নেকা থাকবে না? সেটা মা নিকতেই হবে। আমার তা'হলে কি কাজ থাকবে? আমি রোজ ভিজে গামচা দিয়ে তা পরিষ্কার করব মা!"

কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে। ভ্রমর কহিল—"ঠিক বলিচিস্ বিষ্টু। বিষ্টুর আমাদের বুদ্ধি খুব সুরুখখু। সত্যি, তোমার নামের ট্যাবলেট্ একখানা মারতে হবে।"

রায়সাহেব কহিলেন "শুধু আমার নয়; তোমার আমার তু'জনের নাম এক সঙ্গে থাকবে।"

"পাগল আর কি! ভালোবাসা পাথরের গায়ে ঐ-রকম ছড়ালে, সব যে গড়িয়ে রাস্তায় প'ড়ে যাবে।"

অতএব স্থির হইল, তুই পাশে তুইখানি ট্যাবলেট বসিবে। একখানিতে লেখা থাকিবে—'ভ্রমর-ভিলা' অপর খানায় থাকিবে—'রায়সাহেব নসীরাম সান্ন্যাল'।

৪

তুই মাস পরের কথা।

নব-কলেবরপ্রাপ্ত 'ভ্রমর-ভিলা' সৌন্দর্য্যে ঝক্-ঝক্ করিতেছে। কিন্তু রায়সাহেবের শরীর ভাল নয়। তিনি যেন বড্ডই মন-মরা। তাঁহার আহার কমিয়াছে, ঘুম কমিয়াছে। সর্ব্বদাই যেন একটা চিন্তায় মগ্ন থাকেন

আর মধ্যে-মধ্যে কাগজ পেন্‌সিল লইয়া কি সব হিসাব করেন।

ভ্রমর কহিল—"আমার মাষ্টারীর ফলে কিন্তু তোমার লেখাপড়ায় চাড় বেড়েচে। দিন-রাতই ত দেখি অঙ্ক কষচো।"

একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রায়সাহেব কহিলেন—"দশটি হাজার গেল ভোমর!"

"কিসের দশটি হাজার?"

"এই তোমার গিয়ে, মোটর কেনা থেকে আরম্ভ কোরে, গ্যারেজ, ফটক, বাড়ী-মেরামত, গম্বুজ-ঘর—সব নিয়ে। দশ হাজার All ready গেছে, তবু এখনো ফার্নিচারের সব—দাম শোধ হয়নি।"

"টাকা থাকলেই খরচ হয়। কি-বাড়ী ছিল আর কি হোয়েচে দেখ দেখি। কোথায় এর জন্যে মনে আহ্লাদ করবে, না—মন গুমিয়ে দিনরাত খালি বোসে থাক! মনের আনন্দে আমার অম্বলের অসুখ সেরে গেল আর তোমাকে যে দেখছি অসুখে ধোরলো। খাওয়া ত তোমার একেবারেই গিয়েছে।"

"আহারটা কমেছে সেটা ভালই হোয়েচে। খাওয়া বেশী মানেই—বেশী খরচ।"

"নাঃ, তোমার সঙ্গে আর আমি পারলুম না।" ভ্রমর

রাগ করিয়া ও-ঘরের নতুন সোফাখানার উপর গিয়া বসিল। রায়সাহেব পিছু পিছু আসিয়া সম্মুখের একখানা চেয়ার-এ বসিয়া-পড়িয়া কহিলেন—তুমি রাগ করলে ভোমর ?"

"আমার পাশে এসে বোসো ; তবে তোমার কথার জবাব দোবো।"

সোফার উপর ভ্রমরের পাশে গিয়া বসিলে, ভ্রমর তাঁহার হাতখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিল— "তোমার ওপর কি কখনো রাগ করতে পারি ? মানুষের বাঁচা-মরার কথা ত বলা যায় না ; কবে হয় ত টপ করে মরে যাব। যে ক'টা দিন আছি, সিঁথের সিঁদুর পরে, তোমার সেবা কোরে, সুখে-আনন্দে কাটাতে পাল্লেই বাঁচি।"

রায়সাহেব কাতর হইয়া কহিলেন—"অমন অ-লক্ষুণে কথা মুখে এনো না ভ্রমর ! তুমি গেলে কি আমি থাকবো মনে কর ? সব পুড়িয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী সেজে লোটা-কম্বল নিয়ে তা হোলে হিমালয়ে চলে যাব। তা' হোলে ত জগৎ আমার কাছে অন্ধকার হোয়ে যাবে ? তোমার জন্যেই ত সব।"

"তবে মন-খারাপ কর কেন ? টাকা-পয়সা ক'দিনের জন্যে ? কিন্তু তুমি-আমি যে চিরদিনের—চিরকালের—

জন্ম-জন্মান্তরের। মন-খারাপ কোরে থাকতে আছে কি? বাবা বোলেছিলেন, ঠিকুজিতে আমার এই ৪১ বছর বয়সে—"

একটু যেন আশ্চর্য্য হইয়া রায়সাহেব কহিলেন—"বয়স তোমার ৪১ বছর হ'ল?"

"তা হ'ল বৈকি। তোমার চেয়ে ত আমি আট বছরের ছোট। তবে আমার আঁট-সাঁট গড়নের জন্য কেউ বয়স ঠাওরাতে পারে না। তাই আমার বেণী ঝোলানও খাটে, নীলাম্বরী পরাও সাজে। সবাই মনে করে, বয়স আমার সাতাশ কি আটাশ! তোমারও অনেকটা তাই।"

"আমাকে কি উনপঞ্চাশের মত দেখায় না?"

"না। তোমার মত সুন্দর চেহারা ক'টা বেটাছেলের আছে! যেমন চোখ, তেমনি নাক, তেমনি কপাল, তেমনি—"

"কপাল নিশ্চয়ই ভালো; নইলে তোমার মত এমন ভ্রমরকে পেয়েচি।"

"তোমার মাথার টাকটা যদি একটু ছোট হোত, আর ভুঁড়িটা যদি অন্ততঃ আর্দ্ধেক হোত, তা হ'লে ত তোমার মত—যা'ক, যা বলছিলুম, আমার এই ৪১ বছর বয়সে নাকি একটা ফাঁড়া আছে। তা তার জন্যে—"

বাধা দিয়া, একটু ভীত হইয়া রায়সাহেব বলিলেন—"ফাঁড়া! তোমার?"

"হ্যাঁ। তা' সেই জন্যেই ত এটা-ওটা নিয়ে আমোদ-আহ্লাদে থাকি। গান গাইতে জানি না, তবু মনের আনন্দে গুন্-গুন্ কোরে যখন-তখনই গুঞ্জন করি।"

"ভ্রমর—গুন্-গুন্ ত করবেই।"

"ঐ ওদের বাড়ীর 'রেডিও'তে দিন-রাত্তিরই ত গান হোচ্চে, তাই শুনি আর মনটায় ভারি আরাম পাই। তা, এতটা দূর থেকে কি ছাই আর শোনা যায়! তবুও বারান্দার ঐ কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে—"

"দাঁড়িয়ে থেকে—?"

"ঐ 'রেডিও'রই একটা গানের মত—'আমি কাণ পেতে রই—আমি কাণ পেতে রই! ও আমার আপন হৃদয়-গহন-দ্বারে—"

"ঐ গানটাই ত গুন্-গুন্ কোরে তুমি প্রায়ই গাও—'ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগী, নিভৃত-নীল-পদ্ম লাগি'—তাই না? দেখো, যেন কোন দিন তুমি বিবাগী হোয়ে চোলে গিয়ে আমায় প্রাণে মেরো না—গানটা তার পর কি?"

"কি জানি ছাই! ঐ যে বললুম, শুনতে এত ভালবাসি, তা এত দূর থেকে কি আর ভাল শোনা যায়!

রেডিওর গান শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে। তখন আমার ফাঁড়া-টাঁড়ার কথা কিছু আর মনে থাকে না।"

সোজা হইয়া গা-ঝাড়া দিয়া বসিয়া রায়সাহেব কহিলেন—"মনে রেখোও না। আমি এই ঘরে তোমার জন্যে ভাল রেডিও-সেট্ বসিয়ে দোবো ভোমর। তোমার সুখের জন্যেই আমার সব। এই হপ্তার ভেতরই আমি——"

ভ্রমর বাধা দিয়া বলিল—"না না, ও-সব এখন থাক্; ওর চেয়ে বরং যেটা বেশী দরকারী—তার মানে, 'টেলিফোন'টা নিলে খুবই ভাল হয়। একটা রায়সাহেবের বাড়ী ত; 'টেলিফোন' না থাকলে যেন——তুমি বোসো; এক কলকে তামাক সেজে নিয়ে আসি"—বলিয়া ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইল।

রায়সাহেব ভ্রমরের হাত ধরিয়া, মরিয়া-হইয়া কহিলেন—'রেডিও' টেলিফোঁ'—দুই-ই আমি এনে ফেলচি। তোমার সুখের জন্যেই আমার—। তুমি বোসো ভোমর।"

তথাপি ভ্রমর এক কলিকা তামাক সাজিয়া আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

৫

ভ্রমরের শয়নঘরে অপরাহ্ণবেলায় 'রেডিও'তে কিসের একটা বক্তৃতা হইতেছিল। কি একটা সেলাই করিতে করিতে ভ্রমর তাহা শুনিতেছিল—

'......তথাপি ভারতের মনীষিগণ ভারতের নারীকেই শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছেন। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পুরুষের অপেক্ষা উদারতায় নারীহৃদয় হীনতর হইলেও, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষকে পরাজিত করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে——'

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—

ভ্রমর তাড়াতাড়ি দালানে আসিয়া টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলিয়া লইল।

—"হাল্লো; কে আপনি?...আমি হ্যাঁ, আমি ভ্রমর। খোঁড়া হয়নি ভাই; খোঁড়া হোলে যাওয়া আট্‌কাতো না; মোটর ত আর খোঁড়া হয়নি।......কি আর বলবো, যা' বলো তাই।......এসো; না এলে দুঃখিত হব।...... নিশ্চয়ই; আমার মাথার দিব্যি থাকলো।......হাঃ হাঃ হাঃ! সে-কথা তোমাদেরই খাটে; আমরা ত এখন বুড়ীর দলে।......ঘুমুচ্চেন।......মনে যদি করি, ঘরের

ভাত না বেশী করেই খাব।……আচ্ছা।…আচ্ছা, আচ্ছা।”

রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া, ঘরের মধ্যে আসিয়া সেলাই-এর কাজটা হাতে লইয়া বসিতেই, বিষ্টুচরণ ব্যস্ত ভাবে আসিয়া কহিল—“মা, বাবু নেই!”

“নেই মানে?”

“বাবুকে কোথাও পাচ্ছি না যে।”

“ও-ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন না?”

“না।”

“তা হলে অন্য কোন ঘরে ছাখ গিয়ে।”

“সব ঘর দেখেচি মা, কোথাও নেই তিনি।”

“নীচেও নেই?”

“না।”

“তা হ'লে বোধ হয় পাইখানায় গেছেন।”

“সব দেখেচি মা।”

“তা হ'লে কি বাইরে-কোথাও গেলেন?”

“সদর দরজা ত ভেতর থেকে খিল দোয়া রয়েচে।”

তখন ভ্রমর উপরের ও নীচের সব ঘর দেখিল। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বৈঠকখানা, সিঁড়ীর নীচে, আশে-পাশে, তক্তাপোষের তলায়, খাটের নিচে, কয়লা-রাখার জায়গায়, ঘুঁটের মাচায়, দেরাজের পিছনে—তন্ন-তন্ন

করিয়া কোনওখানে আর খুঁজিবার বাকী রহিল না। কিন্তু রায়সাহেবকে পাওয়া গেল না। ভ্রমর একটু ভীত হইয়া পড়িল। বিষ্টুকে, বামুনঠাকুরকে, ননীর-মা ঝিকে এবং 'সোফার'কে চারি দিকে সন্ধানের জন্য পাঠানো হইল।

পাঠাইয়া ভ্রমর ছাদের উপরটা দেখিবার অভিপ্রায়ে তে-তালায় আসিল। আসিয়া দেখিল—অদ্ভুত ব্যাপার! গম্বুজ-ঘরের ভিতর মাল-কোঁচা আঁটিয়া গলদ্ঘর্ম্ম-দেহে রায়সাহেব দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছেন।

ভ্রমর চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল—"এ কি ব্যাপার?"

একটু ডন্ দিচ্ছিলুম। তুমি সে-দিন ভুঁড়ি কমাবার কথা বোল্লে, তাই—"

প্রবল একটা হাসির উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ভ্রমর মুখে আঁচল চাপিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

"পারি না ভোমর; দেহটা একটু ভারি কিনা, হাঁপিয়ে যাই"—বলিয়া রায়সাহেব মাল-কোঁচা খুলিয়া ফেলিলেন। ভ্রমর কহিল—"বুক আর পেট ত ধূলোয় একেবারে ধূসরিত!" আঁচল দিয়া ভ্রমর রায়সাহেবের ধূলো ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল—"বুকের এখানটা ছোড়ে গেল কি কোরে?"

"ঐ যে বললুম, পারি না আর; কব্জিতে ভর রাখতে

না পেরে হুম্‌ড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। ঐখানটায় ঘ্যাস্‌ড়ানী লেগে—"

"নাঃ, তোমাকে নিয়ে আমার মরণ! ইস্! অনেকটা ছড়ে গিয়েছে। চলো, একটু টিঞ্চার আইডিন দিয়ে দিই-গে"—বলিয়া ভ্রমর রায়সাহেবের হাত ধরিয়া দোতালায় নামিয়া আসিল।

পরদিন রায়সাহেব তাঁহার বুকে ও পেটে একটা ব্যথা অনুভব করিলেন। ভ্রমর কহিল—"ঐ ডন্ দেবার জন্যেই হোয়েচে। বিষ্টু বেশ ভাল ক'রে তেল মালিস কোরে দিক। আর না হয় নেপেন ডাক্তারকে একবার ডেকে আনুক।"

নেপেন ডাক্তার আসিয়া রায়সাহেবকে দেখিলেন। কহিলেন—"ও কিছু নয়; একটু সরসের তেল গরম কোরে মালিস করলেই যাবে'খন। ক্ষিধে টিধে, ঘুম-টুম বেশ হয় ত?"

রায়সাহেব বলিলেন—"না। ক্ষিধেও নেই, ঘুমও নেই, মাঝে মাঝে বুকটা যেন খালি ঠেকে।"

"কোন-কিছু বেশী ভাবেন কি?"

"না—তা—এমন বিশেষ কিছু—"

বাধা দিয়া ভ্রমর কহিল—"হ্যাঁ, ভাবেন বই কি। বারণ কোল্লেও শুনবেন না!"

নেপেন ডাক্তার আবার রায়সাহেবের বুক প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"বিশেষ কিছু ত পাচ্চি না, তবে খুব weak। একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্চি, সেইটে দু'বেলা খাবার পর খাবেন। আর কোলকাতা ছেড়ে দিন-কতক যদি একটু ফাঁকায় গিয়ে থাকবার সুবিধে হয়, তা হ'লে খুবই ভাল হয় বেশী দূরে নয়, এই কাছাকাছি কোথাও—বরানগর, দম-দম, বারাকপুর, কি বেহালার ঐদিকে। কোলকাতার জল-হাওয়াটা বড্ড খারাপ হোয়ে উঠেছে।"

নেপেন ডাক্তার চলিয়া গেলে, ভ্রমর কহিল—"এত বলি যে, টাকার জন্যে ভেবে-ভেবে মন-খারাপ কোরো না, তা ত কিছুতেই শুনবে না।"

"টাকার জন্যে ত ভাবি না ভোমর; তোমার কাছে আবার টাকা?"

"মুখে ত বল, কিন্তু ভেতর-ভেতর ভাবতেও ত ছাড় না।"

সহাস্য বদনে রায়সাহেব কহিলেন—"সত্যি কথা বোলবো? বেশী ভাবি না; একটু-একটু ভাবি। তা আর ভাবব না। তুমি যখন বারণ কোচ্চো, তখন আর কিছুতেই ভাববো না—একদম্ না।"

"আমায় গায়ে হাত দিয়ে বল।"

প্রফুল্লবদনে রায়সাহেব ভ্রমরের কাঁধ ধরিয়া বলিলেন —"আর ভাববো না, ভাববো না।" সঙ্গে-সঙ্গে মস্তক আন্দোলন; যেন কালবৈশাখের ঝড়ে তালগাছের মাথা দুলিতে লাগিল।

ইহারই দিন দুই-চার বাদে, একদিন ভ্রমর মোটরে করিয়া বেড়াইয়া-ফিরিয়া রায়সাহেবকে কহিল—"সব শুদ্ধু এ পর্য্যন্ত কত টাকা আমাদের খরচ হ'ল ?"

রায়সাহেব একটু ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন—"সে যতই হোক্; তোমার সুখের জন্যই ত টাকা। তুমি যে সুখী হোয়েছ, মনের আনন্দে আছ, সেই আমার সব।"

স্বামীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ভ্রমর বলিল—"তবু, কত টাকা খরচ হোয়েচে বলো না, আমার দরকার আছে।"

"তা প্রায় ১১ হাজার হবে।"

"এগারো হাজার ? এ টাকাটা আমি তুলে ফেলচি। ঠিকই উঠে আসবে।"

"তুমি কোথায় গিয়েছিলে বল ত ?"

"কেষ্ট ঠাকুরপোর বাড়ীতে। ঠাকুরপো ৩ কাঠা জমী কিনেছিল ও-বছর চার হাজার টাকায়, সেটা ৭২০০ টাকায় বেচে ফেল্লে। জমীর কেনা-বেচাতেই ত মোটা লাভ।"

"তা তুমি কি……"

"শোন; ১১ হাজার টাকা ঠিক তুলে ফেলবো। একটা চমৎকার বাগান-বাড়ী বিক্রী আছে বেহালায়। টাকার খ্যাচ; শীগ্গীর কিনতে পাল্লে খুব সস্তায় হ'বে। বোধ হয় হাজার বারোর মধ্যেই হবে। পাঁচ বছর পরে তিন গুণ দামে বিক্রী হবে।"

"পুরোণো বিল্ডিং ত ?"

"একেবারে নতুন; ঝক্-ঝক্ করচে। ঠাকুরপো যে দেখিয়ে নিয়ে এল। সাড়ে ৭ বিঘে জমীর ওপর বাগান। নীচে ওপরে ৭ কামরা ঘর, দিগ-দৌড় বারান্দা, তক্-তক্ কোচ্চে পুকুর, সান-বাঁধানো ঘাট; আর কত ফল-ফুলের গাছ! ফুল ফুটে বাগান হ'য়ে আছে যেন একে-বারে নন্দন কানন।"

রায়সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

ভ্রমর তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—"এটা কিনতেই হবে। বছর পাঁচেক আমরা একটু ভোগ কোরে তারপর বেচে ফেললেই হবে। বেহালার ওদিকে ক্রমেই জায়গা-জমীর যে-রকম দাম বাড়চে, ওটা তখন ঠিক ৩০ হাজার টাকায় বিক্রী হ'বে।"

তত্রাচ রায়সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

দুই হাতে তাঁহার কাঁধ জড়াইয়া ধরিয়া ভোমর

বলিল—"আরজির একটা রায় দাও গো রায়সাহেব, নইলে ছাড়চি-নে।"

মৃদু হাসিতে হাসিতে রায়সাহেব বলিলেন—"তোমার আনন্দের জন্যেই ত আমার সব, ভোমর। তা, সেই বাগান তোমার পছন্দ হোয়েচে?"

"খু-উ-ব,—চুড়োন্তো রকম পছন্দ হোয়েচে।"

"তা হোলে কেনা হোক।"

অতঃপর ভ্রমর স্বামীর মুখ নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া যে কার্য্যটি করিল, ও-বয়সে কাহারও তাহা মানায় না।

যাহা হউক, তড়ি-ঘড়ি ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়া দিন-পনরর মধ্যেই বেহালার সেই বাগান কেনা হইয়া গেল। ভ্রমর বলিল—"ডাক্তার তোমাকে কিছুদিন বাইরে থাকবার জন্যে ব'লেছিলেন; চল, মাসখানেক বাগানে গিয়ে থাকি।

তার পর প্রথম যে-দিন বাগানে আসিয়া রায়-সাহেব দোতালার দক্ষিণের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসিয়া গড়গড়ায় ধূম পান করিতেছিলেন, তখন ভ্রমর একরাশ ফুল তুলিয়া আনিয়া কহিল—"কত সুন্দর বল ত শুনি!"

রায়সাহেব কহিলেন—"ও ত সুন্দর; আর ফুলের

মাঝখানে ভ্রমর—আরও সুন্দর। আজ তোমাকে খুব চমৎকার দেখাচ্চে।”

“দেখাবেই ত; আজ যে আমি রায়সাহেবের বউ!”

বোধ হয় মানেটা রায়সাহেব ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। ভ্রমর কহিল—“বুঝতে পাচ্চ না? বাড়ী, গাড়ী রেডিও, টেলিফোঁ, কাপড়-চোপড়, গয়না-পত্তর—কিছুই ত বাকী ছিল না; কেবল বাকী ছিল—এই রকম একখানা বাগান। তা'ও হ'ল শেষে; সুতরাং আজই ত আমি যথার্থ রায়সাহেবের বউ।”

প্রফুল্ল দৃষ্টিতে রায়সাহেব ভ্রমরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ

বরষার প্রভাত।

পূর্ব্বরাত্রে সারাক্ষণই ঝম্ ঝম্ করিয়া অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে। ভোরের দিকে বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে; কিন্তু এখনও খিড়কীর প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটায় মাঝে মাঝে জোর বাতাসের এক একটা ধাক্কা আসিয়া লাগাতে, বৃক্ষসঞ্চিত জলবিন্দুগুলি তলাকার কচুবনের উপর ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতেছে। সহরতলীতে আছি বলিয়াই আজ এই দৃশ্য ও শব্দের মধ্যে যেটুকু মাধুর্য্য আছে তাহা উপভোগ করিতে পাইতেছি। সহরের ইঁট-পাথরের পাষাণরাজ্যে আর এ সমস্তর স্থান নাই। কিন্তু ছেলে-বেলার কথা মনে পড়ে। নিস্তব্ধ নিশীথ। চারিদিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার! পাড়া-গাঁয়ের সেই পুরাণো বাড়ীর কোণের ঘরখানির মধ্যে ঠাকুরমার কাছে আমরা তিন ভাই-বোন শুইয়া আছি। ঠাকুরমার কি-একটা দৈত্যের রূপকথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া গিয়াছিলাম। তার পর দীর্ঘ রাত্রের মধ্যে যদি কখনো ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, বালিসে মাথা দিয়া শুনিয়াছি—হয়ত ঝম্ ঝম্ শব্দে

অনবরত বৃষ্টি হইতেছে, নয়ত বা জানালার ধারের বৃহৎ গাব গাছটা হইতে, তলাকার কচুগাছগুলার পাতার উপর টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা পড়িয়া অপূর্ব্ব শব্দের সৃষ্টি করিতেছে। সেই শব্দ শুনিতে শুনিতেই অল্পক্ষণ মধ্যেই আবার ঘুমাইয়া পড়িতাম। রাত্রির নীরবতা, অন্ধকার পল্লীগ্রামের বাড়ী, অতি পরিচিত সাধারণ শয্যা, ঠাকুরমা, আর সর্ব্বোপরি শিশু-মন—এই সকল সংমিশ্রণে কি-যে একটা অপূর্ব্ব ভাব তখন মনকে ভরাইয়া তুলিত, এখন সে মহামূল্য ভাবের যেন আর ধরা-ছোঁয়াই পাওয়া যায় না।

বাল্য এবং যৌবনকালটাই মানুষের মনের মধ্যে স্বর্গের সুষমা সৃষ্টি করে। তারপর শরতের মেঘের মত ধীরে ধীরে সে স্বর্গীয় ভাবটা সরিয়া যায়। আজ কোথায় আমার সেই বাল্যকাল আর কোথায়ই বা আমার সেই মণিপুর গ্রাম! আজ চির-অপরিচিত, মাধুর্য্যলেশ-বর্জ্জিত স্থানের এক অজানা পথের মাঝে জীবন-সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তাহাতে না আছে আশা, না আছে সুখ, না আছে উৎসাহ। এই অভিশপ্ত জীবন—মহাপাপের ফল ছাড়া আর কিছুই নহে। একদিন জীবন-মধ্যাহ্নে নগরের মোহে আকৃষ্ট হইয়া, আমার পল্লীজননীকে অবহেলায় ত্যাগ করিয়া যে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম,

সেই মহাপাপেরই বুঝিবা এই অভিসম্পাত! আমার সেই সাতপুরুষের ভিটা আজও একেবারে লোপ পায় নাই। আজও সে তার অস্থিমাত্রসার বক্ষোপঞ্জর হইতে বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ধুঁকিতেছে!

আমার মণিপুর গ্রামের তুলনা ছিল না। জগতের সে যেন মুকুটমণি। পরিপূর্ণ রূপ যৌবনে সমৃদ্ধা আমার সেই পল্লী-জননী আজ হৃত-শ্রী, ধূলায় অবলুণ্ঠিতা। তাহার কুঞ্জ-কাননগুলি আজ জঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়াছে, তাহার পথ-ঘাটগুলি আজ বিলুপ্তপ্রায়। তাহার কোল দিয়া যে 'রূপসী' নদীটি নিশিদিন হর্ষে আকুল হইয়া কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইত, আজ তাহার কোন রূপ নাই। আজ তাহার অধিকাংশই হাজিয়া-মজিয়া গিয়াছে। তাহাতে আর স্রোত বহে না। প্রায় তাহার সর্ব্বদেহটাই কচুরিপানা দখল করিয়া বসিয়াছে।

মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, পূর্ব্বকার মণিপুরের মধুর রূপ অন্তরে ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা আকর্ষণ আসিয়া মনকে নাড়া দিল। উঠিয়া পড়িলাম।

পূর্ব্ব রাত্রে সারাক্ষণই অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সকালেও মেঘের ঘোর কাটে নাই; সারা আকাশে মেঘের খণ্ডগুলি জমাট বাঁধিয়াছিল। কিন্তু যখন উঠিলাম তখন দেখি, পূর্ব্বদিকের খণ্ড-মেঘগুলিকে একটু সরাইয়া

দিয়া সূর্য্যদেব উঠিয়া পড়িয়াছেন। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মণিপুর যাইব।

হুগলী জেলারই একটি গণ্ডগ্রাম—মণিপুর। ষ্টেশন হইতে ক্রোশ-দেড়েক পথ হইবে। কিন্তু 'রূপসী'কে যেখানে পার হইয়া আসিতে হয়, শ্রাবণের এই ভরা বর্ষায় এখন সেখানে অথৈ জল। পারাপারের কোন সুযোগ নাই। আগের দিনে ছিল, কিন্তু এখন আর সে সব কিছুই নাই। সুতরাং আগের ষ্টেশনে নামিয়া চারিক্রোশ পথ গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়।

বেলা একটার পর আমাদের সেই ছোট রেলের ছোট ষ্টেশন 'বন-ডাঙ্গা'য় নামিয়া গরুর গাড়ীতে চাপিলাম। গাড়োয়ানকে বলিলাম—'একটু হাঁকিয়ে যাবে, যাতে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছতে পারি।'

বেলা তিনটার মধ্যে 'তালবোনা' 'রামহরিপুর' ছাড়াইয়া 'দেহাটা'য় আসিয়া পড়িলাম। সেদিন 'দেহাটা'র হাট ছিল। হাটতলায় হাট লাগিয়াছিল। একটা ময়রার দোকানের সামনে গাড়ী থামাইয়া কিছু সন্দেশ কিনিয়া জল খাইলাম। ময়রা জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন গাঁয়ে যাবেন গা বাবু?' কহিলাম, 'মণিপুর।'

'মণিপুরে কাদের বাড়ী?'

'নায়ের পাড়া।'

'কোলকাতা থেকে আসচেন কি?'

'হ্যাঁ।'

'আবার যুদ্ধু বাধবে শুনচি; তা, কিছু-কি-রকম খবর-টবর শুনে এলেন কি?'

যতটা সম্ভব সংক্ষেপ উত্তর দানের পরই গাড়ী আবার চলিতে সুরু করিল। হাটতলার একপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড গাবগাছের তলায় 'মুরগীর লড়াই' হইতেছিল। লোকে লোকারণ্য। ইচ্ছা হইল নামিয়া ঐ ভীড়ের মধ্যে এক-পাশে গিয়া দাঁড়াই। এই বৃদ্ধ অন্তরের অন্তরালে লুক্কায়িত কবেকার একটি তরুণ মন নাচিয়া উঠিল। মনে হইল, সহর, সহর-বাস, আরাম, বিলাস, সম্ভ্রম, নাম, মান —সমস্ত জাহান্নামে যা'ক। ছেলেবেলাকার মত ছুটিয়া গিয়া ঐ মুরগীর লড়াই দেখি। তারপর ফিরতি-বেলায় হাট করিয়া যখন গাঁয়ে ঢুকিব তখন নন্দ কুমোর, তা'র 'শাল' থেকে হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'দাঠাকুর, লাউটা কত্‌কে হোল গা'?—তিন পয়সা? ঠকেছ গো'—বারোয়ারী-তলা ছাড়িয়ে নায়েরপাড়া ঢুকিতেই দেখিব, রাধু পাল তার চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া চরকায় পাট কাটিতে কাটিতে তাহার চিরকালের স্বভাব অনুযায়ী পালগিন্নীর সঙ্গে অনবরত বকা-বকি করিতেছে। আমাকে দেখিয়া

তাহারি ফাঁকে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিবে, 'ভাইপো, আজ হাটে কলাই ক' পালি দর বিকালো বলতে পার?—' সত্যচরণের দোকানের সামনে খানিক দাঁড়াতেই হবে। সেখানে বলাইকাকা, নিতু গাঙ্গুলী, বগাই হরি, সুরো বোষ্টম প্রভৃতি যে-সব মজার গল্প জুড়িয়া দিয়াছে তাহার কিছু না শুনিয়া কি বাড়ী ফেরা যায়?

ক্যাঁচোর—কোঁচ্! গাড়ীর ঝাঁকানীর সঙ্গে চাকার একটা জোর শব্দে, অতীতের স্বপ্ন-বিভোর মনটা বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিল। 'ছই'এর ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া দেখি, দেহাটার পল্লীসীমা ছাড়াইয়া আসিয়াছি। দক্ষিণে ও বামে ধান-ক্ষেত। দুই মাঠের জল নিকাশের জন্য যেখানে প্রকাণ্ড একটা 'নয়ানজুলী' ছিল, সেইখানে পথে একস্থানে জলকাদা জমিয়া ভয়ানক একটা 'দঁকে'র সৃষ্টি হইয়াছে। গাড়ীখানা সেই 'দঁকে'র মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

ক্যাঁচোর্ কোঁচ্—ক্যাঁচোর্ কোঁচ্!

বলদ দুইটা ছিল খুব বলবান। হিচ্ড়াইয়া গাড়ীখানাকে উঠাইয়া ফেলিল। আরও খানিকটা পথ আসিতেই 'ফুল ডাঙ্গা'র রথতলাতে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। ইহার পরই 'ন্যাস্তার বিল'। 'ন্যাস্তা বিলে'র নাম শুনিলেই গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে বটে, কিন্তু আজকালকার দিনে সে সব ভয় আর নাই। কবে যে ছিল, তাহাও জানি না!

তবে ছিল। অনেক পথিকের প্রাণ-বায়ু এখানকার বাতাসে মিশিয়া আছে। অনেক কাতরকণ্ঠের আর্ত্তনাদ অনেক ভয়-চকিত চক্ষের জল এখানে জমা হইয়া আছে। উচ্চ পথের দুইপার্শ্বে সুদূরপ্রসারী বিল ধূ ধূ করিতেছে। বর্ষার জলভারে বিল এখন কাণায়-কাণায় পূর্ণ। মৃদু পবনাঘাতে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে। কী তাহার মহান দৃশ্য! কী তাহার অনুপমেয় সৌন্দর্য্য! বালিগঞ্জের হাতেকাটা 'লেক্' ইহার পদরেণুরও যোগ্য নয়। ইহাতে আর তাহাতে! পূর্ণচন্দ্রের সহিত জোনাকীর তুলনা! অথচ এই জোনাকীর মিট্-মিটে আলোর জন্যই আমরা পাগল হইয়া ছুটি। ইহাকেই বলে—সোনা ফেলে শূন্য আঁচলে গেরো!—এমনি অধঃপাতে আমরা গিয়াছি! হায় বাঙালী!

গাড়োয়ান তার থোলো হুঁকায় গভীর তৃপ্তিতে তামাক টানিতে টানিতে কহিল, বাবু মশাই, খুব হাঁকিয়ে এসেছি। এই বিল পার হোয়ে, 'রূপ্সী'র বাঁকে পড়লেই ত মণিপুর। কিছু বক্সিস্ করবেন বাবু।

বেলা বোধ হয় তখন চারিটা আন্দাজ হইবে। আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা 'ন্যানতার বিল' পশ্চাতে রাখিয়া যেখানে 'রূপসী' ঘুরিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, সেইখানে আসিয়া পড়িলাম এবং নদীর ধারের সোজা পথ, যেটি

বরাবর আমাদের গাঁয়ের ভিতর দিয়া গিয়াছে, সেই পথে গাড়ী চলিতে থাকিল। এখান হইতে মণিপুর বেশীদূর নহে। ক্রোশখানেকের মধ্যেই। গাড়োয়ান বলদ-দুইটিকে তাড়না করিতে করিতে কহিল ; আজ আর 'বন-ডাঙ্গা'য় ফিরতে পারব না বাবু। 'নারকোলসাঁড়া'য় কুটুম আছে, সেইখানে রাত্তিরটা থেকে কাল ভোরে চলে যাব। খুসি মত কিছু বক্‌সিস্ করবেন বাবু। আর গিন্নী-ঠাকরোণের কাছ থেকে কিছু 'জলপান' চেয়ে নেবো, তাই খেতে খেতে ফিরবো। বড্ড মেহন্নতটা হোয়েছে বাবু, ক্ষিধেটা তাই—

তাহাকে সবটা শেষ করিতে না দিয়া কহিলাম, কিন্তু যেখানে যাচ্চি, সেখানে কেউ-ই নেই আমার। আছেন সব কোলকাতাতে। তবে সেখানে ঠিক—যাকে তোমরা বল—গিন্নী বা 'ঠাকরুণ' তেমন কেউ নাই। যিনি আছেন তিনি হচ্চেন—'মিসেস্'—

তাহোলে আপনারও 'ইস্তিরি' নেই! গাড়োয়ান সখেদে চমকিয়া উঠিল। আমি কহিলাম, বিশেষরূপেই আছেন। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি সেখানে একা একশত হইয়া বিরাজিত আছেন। তবে কি না, এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। তোমার নামটা তখন কি বল্‌লে—ভুলে গেছি।

আজ্ঞে—বনমালী।

আচ্ছা বনমালী, তোমার স্ত্রী আছে ত?

ইস্তিরী? কথাটা পাড়লেন যদি তবে বলি বাবু। অমন নেমকহারাম জাত বাবু আর আছে কি? আপনাদের ভদ্দর ঘরের কথা বলচি না বাবু। এই আমাদের ছোটলোকের কথা বলচি। দুঃখের কথা বলব কি আপনাকে! দশ বচ্ছর ধরে খেয়ে, পোরে, ঘরের গিন্নীপনা করে, পরের কাণ-ভাঙ্গানিতে ভুলে, তুই আর একজনের ঘর করতে চলে গেলি?

স্ত্রী তোমার তা'হলে তোমার ঘর ছেড়ে বুঝি—

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিও বনমালী বাগ্দী, 'ছাঁচ্তাড়া'র সিদে বাগ্দীকে আমিও ভাল করে একবার দেখে নিয়ে তবে ছাড়বো।

তা হোলে ঘর তোমার শূন্য, বনমালী?

ঘর কি শূন্য রাখতে পারি বাবু? সেই জন্যে, গেল বোশেখে—

আবার শূন্যঘর পূর্ণ করেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এ মেয়েটি খুবই ভাল। বয়স বছর নয় হবে।

তোমার কত বয়স হবে, বনমালী?

তা, দশগণ্ডা-সাড়ে দশগণ্ডা হবে বই কি বাবু।

তা বেশই হোয়েছে।

কথায় কথায় গাঁয়ের হাট-তলায় আসিয়া পড়িলাম। নিজের গৃহ ত আর নাই। সুতরাং শাস্ত্র-বাক্য অনুসারে হাটের মধ্যেই নামিয়া পড়িলাম। অর্থাৎ—'ভোজনং যত্র-তত্র, শয়নং হট্ট-মন্দিরে।' গাড়োয়ানকে তাহার ভাড়ার উপর একটি আধুলি বেশী দিয়া কহিলাম, তোমার বক্‌সিস্ আর জল-পানি।

তখনো সন্ধ্যার বহু বিলম্ব ছিল। সমস্ত দিনটাই আকাশ আজ মেঘশূন্য—পরিস্কার। সূর্য্যদেব যাই-যাই করিয়াও 'মণিপুর'কে দেখিয়া যেন যাইতে পারিতেছিলেন না। তাঁর সারা দিনের পর্য্যটন ক্লান্তিতে সর্ব্বদেহ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। 'রূপসী'র চঞ্চল বক্ষে তাঁহার আরক্ত মুখের ছায়া পড়িয়া অনবরত কম্পিত হইতেছিল।

ধীরে ধীরে আসিয়া 'রূপসী'র তীরে শ্যাম দুর্ব্বাদলের উপর বসিলাম। পুরাতনদিনের কত কথা একটির পর একটি আসিয়া অন্তরের ছিন্ন পুষ্পদলগুলিকে সতেজ করিয়া তুলিতে লাগিল। ও-পারে নদীর উপরেই যে কয়খানা ধানক্ষেত ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলিতে ও-গাঁয়ের কৃষাণরা ধান্য রোপন করিতেছিল। অনেক গুলিতে পূর্ব্বেই রোপন করা হইয়া গিয়াছিল। কয়েক খানা 'ভুঁই'তে এখনো 'রোয়া' বাকী আছে।

একখানা ক্ষেত হইতে কে-একজন বলিল, ওরে, জগো, নিবারণ আর কবে রুইবে রে? যাহাকে বলিল, সে উত্তর দিল্,—'জো' বোয়ে গেলে।

তাই ত দেখছি রে! বলে :—

আষাঢ়ে রোয়া—ধান্‌কে,
শাওনে রোয়া—শীষ্‌কে,
ভাদুরে রোয়া—খড়্‌কে,
আশ্বিনে রোয়া—কিস্‌কে,

তা, ওকি সেই আশ্বিনমাসে রুইবে না কি?

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চির-পরিচিত স্থানের চির-পরিচিত মধুর দৃশ্যগুলি মনের মাঝে গভীর তৃপ্তিদান করিল। এই 'রূপসী', ওই হাটতলা, হাটতলার পার্শ্বে ওই সব কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি, ও-পারের ঐসব ধানক্ষেত, এসব যে আমার প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া আছে। এখানকার প্রত্যেক জিনিষটি, মায় গাছপালা, মাটি, বাতাস, ঝোপ-ঝাড়, পথরেখাটি পর্য্যন্ত আমার যে পরম আত্মীয়। পরম আত্মীয়দের মাঝে আসিয়া বহুদিন পরে সারা মন পরম তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তৃপ্তির তন্ময়তা কাটিয়া গেল—শাঁকের আওয়াজে। আমিই না হয় ছন্নছাড়া হইয়াছি, জাহান্নামে গিয়াছি, কিন্তু মণিপুরকে অবলম্বন করিয়া এখনো অনেকেই আছে। এখনো তাহার পাড়ায়

পাড়ায় বহু তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার দীপ জ্বলে, গৃহাঙ্গণ হইতে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠে। ঠাঁকুরবাড়ীর ভাঙ্গা মন্দির হইতে এখনো আরতির কাঁসর, ঘণ্টা সন্ধ্যার মধুর ক্ষণে বাজিয়া উঠিয়া সারা গ্রামকে সজাগ করিয়া তুলে।

যাহারা গিয়াছে তাহারা যাউক, তোমরা থাকো। যাহার মাটিতে তোমরা জন্মাইয়াছ, তাহার মাটিতেই তোমাদের অস্থিদান করিও। তাহার বাতাসে যেন তোমাদের শেষ নিঃশ্বাস মিলাইয়া যায়। তোমরাই মহৎ, তোমরাই ভাগ্যবান, তোমরাই পুণ্যবান। জন্মভূমিকে অবহেলা করিয়া, সাত পুরুষের ভিটাকে ঘৃণা করিয়া, আ-বাল্যের আত্মীয়তা নষ্ট করিয়া যারা গিয়াছে তারা নিষ্ঠুর, তাদের অন্তঃকরণ নাই। তারা মহাপাপী! এ মহাপাপের ফল একদিন না একদিন ভোগ করিতেই হইবে। তেমন দিনের আর বেশী দেরীও—

কে গো মেজ কর্ত্তা নাকি?

চমকিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া দেখি—গোঁসাই জেলে তাহার 'খ্যাপ্‌লা' জালখানা ঘাড়ে করিয়া গাঁয়ে ফিরিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে রে—গোঁসাই? সে কাছে আসিয়া, আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, আরে চাটুয্যেমশাই, যে গো! কবে আসা হলো গো?

এই ত আসছি গোঁসাই, ভাল আছ তুমি ?

ভাল আর কেমন করে থাকব চাটুয্যেমশাই ? নদী পুকুর ডোবাগুলো ক্রমেই তোমার গিয়ে সব বুজে আসতে লাগল ; মাছ আর জন্মায় না। বোশেখ জষ্টি মাসে একবার এসে 'রূপ্সী'র অবস্থাটা নিরীক্ষণ করে দেখো। কি মণিপুর আমাদের ছিল, আর কি হোয়েছে!—একটু থামিয়া গোঁসাই আবার বলিতে লাগিল, ওই ওরা সব 'তিরপুনি'র চাল-কলে কাজ করতে গেল। ভাবলুম যাই, চাটুয্যেমশাই, ওদের সঙ্গে! শেষে ভাবলুম, জন্মথান ছেড়ে বিদেশে পড়ে থাকব। খাই না খাই সাতপুরুষের দেশ-ভিটে ছেড়ে অরে কোন ঠাঁই যাব না।

গোঁসাইর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিল, তা হোলে চাটুয্যে মশাই, দিন কতক এখন অবস্থান হবে ত ?

অবস্থান করবার মত ঠাঁই ত আমার গাঁয়ে রাখিনি গোঁসাই! কালকের দিনটা সারদার ওখানে থেকে, পরশুই আবার চলে যাব।

সারদাদের বাড়ীতেই গিয়া উঠিলাম। সারদা 'শ্রীধরে'র 'শীতল'টি দিয়া সেইমাত্র চা'য়ের বাটি সম্মুখে লইয়া বসিয়াছে। আমাকে হঠাৎ দেখিয়াই একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বলিল, এই তোমার কথা খানিক

আগে বসে বসে ভাবছিলুম যে, অনেকদিন আর কোন চিঠি-পত্তর পাই নি। তারপর 'শ্রীধরে'র 'শীতল'টি দিয়ে—

পাড়াগাঁয়ের শ্রীধর! এ সৌভাগ্য আর কতদিন তোমার থাকবে? এখনো তুমি পূজা, ভোগ-রাগ, শীতল, পাইতেছ। সহরের বাবু-সাহেবদের মত এখনো তোমায় এরা অনাদরে দূর করিয়া দেয় নাই। সহরের বাবু-সাহেবরা, দিদিবাবুরা তোমার বালাই ঘুচাইয়াছে। যে দু-এক বাড়ীতে তোমার পূজা অর্চ্চনা হয়, সে বাড়ীর কর্ত্তারা—হয় বিকৃতমস্তিষ্ক, নয়ত বা পৈত্রিক 'উইলে'র আইনে আবদ্ধ।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। সারদা কহিল, ওহে এসে পড়েছ—ভালই হোয়েছে। আজ 'পূব-পাড়া'য় থিয়েটার হবে, শোনা যাবে এখন। গাঁয়ের ছেলেরাই করবে।

কি, পালা হবে?

বিল্বমঙ্গল।

সুতরাং সকাল-সকাল আহারাদি সারিয়া পূব-পাড়ায় থিয়েটার দেখিতে যাওয়া গেল। থিয়েটারের নাম শুনিয়া আশ-পাশের দশখানা গাঁয়ের লোক আসিয়া জমিয়াছে। লোকে লোকারণ্য। আসরে তিল-ধারণের স্থান নাই। সৌভাগ্যের বলে এক পাশে আমরা একখানা বেঞ্চ

পাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আকাশ আজ পরিষ্কার। বৃষ্টির সম্ভাবনা মোটেই নাই। তথাপি এমন দিনে, শ্রাবণমাসের বর্ষার মাঝে ইহাদের থিয়েটারের সখ হইল কেন ? সারদা কহিল, জ্যৈষ্ঠি মাস থেকে এদের চেষ্টা চলে এসে শ্রাবণে দাঁড়ালো।

যাই হোক, প্রথম ঘণ্টা, দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিবার পর তৃতীয় ঘণ্টার সঙ্গে-সঙ্গেই বহু আকাঙ্খিত 'ড্রপ্' ধীরে ধীরে উঠিতে সুরু করিল। সহস্র দর্শকের উৎসুক দৃষ্টি মঞ্চের উপর পড়িল। কিন্তু চক্ষের নিমেষে এক বিকট শব্দের সহিত মঞ্চ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল—বড় মজার। 'ড্রপ্ সিনে'র নিম্নস্থ 'রোলার' নির্ম্মাণ করা এই পাড়া-গাঁয়ে বড়ই কষ্টসাধ্য। সুতরাং সকলের মিলিত পরামর্শের ফলে এই ব্যবস্থা হইল যে একটি সুপারা গাছকে মাপ মত কাটিয়া তাহাই 'রোলার' করা হইবে। কোন হাঙ্গামা নাই, চাঁচিতে-ছুলিতে হইবে না ; একেবারে প্রকৃতি-দত্ত 'রেডি মেড্ রোলার'। সুতরাং সেই অনুযায়ীই কাজ হইয়াছিল। কিন্তু এটা কাহারো চিন্তার মধ্যে আসে নাই যে বেচারা বহুদিনের পুরাতন 'ড্রপসিনে'র কাপড়খানা, আস্ত সুপারী গাছের ভার বহিতে সক্ষম হইবে কি না ; বিশেষত—শ্রাবণের বর্ষায়-ভিজা সুপারী গাছ।

যাহা হউক, থিয়েটারের ছেলেরা দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত অবাধ্য 'রোলারটি'কে বেশ ভাল রকম 'কাণে পাক' দিয়া 'ড্রপে'র সঙ্গে আবার লাগাইয়া দিল। 'ফুট্-লাইটে'র বাতিগুলি যাহা শ্রেণীবদ্ধ উপুড়-করা কলিকার মস্তকে দাঁড়াইয়া জ্বলিতে জ্বলিতে, সুপারী বৃক্ষ পতনের ফলে, সব উল্টাইয়া পড়িয়া নিবিয়া গিয়াছিল, সেগুলি আবার জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। তখন আবার উৎসাহ ও আনন্দ ফিরিয়া আসিল। আবার ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

এবার নির্ব্বিবাদে 'ড্রপ' উঠিল। এবং দর্শকদের একটা আনন্দ-কোলাহলে আসর মুখরিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গেই বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ—'একবার দেখে নেবো, একবার দেখে নেবো—একবার দেখে নেবো !'

মচ্ মচ্ মচ্—ধপ্—ধড়াস্! বিকট শব্দের সহিত আবার অন্ধকার! শেষ 'দেখে নেবো' বলবার সময় বিল্বমঙ্গল 'প্লাট্ফরমে' এত জোরে পদাঘাত করিল, যে পুনরায় সুপারী বৃক্ষের পতন !

হায়! কি কুক্ষণেই যে ইহারা আজ অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিল! সারদা কহিল, ঘোর 'তেরস্পর্শ'! আমি কহিলাম, তেরস্পর্শ ছাড়বে কখন বল ত ? আমাকে যে কাল সকালেই আবার ফিরতে হ'বে। তখনো এই 'তেরস্পর্শ' থাকবে না কি ?

সারদা কহিল, ছাড়বে কাল সেই বেলা পাঁচটার পর। সুতরাং কাল তোমার যাওয়া হতেই পারে না।

এদিকে থিয়েটারের এই ব্যবস্থা করা হইল, যে, 'ড্রপ্‌খানা' খুলিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে অন্য একখানি 'সিন' টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। যদিচ তাহাতে একটু বে-মানান দেখাইবে, কিন্তু উপায় কি? তাহাই হইল। তখন নির্ব্বিবাদে অভিনয় সুরুও হইল, শেষও হইল।

শেষ রাত্রে সারদার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া একটু এ-পাশ ও-পাশ করিতেই সকাল হইয়া গেল। সারদার 'বারমেসে' কৃষাণ গোষ্ঠ লাঙ্গলখানাকে বলদ জোড়ার কাঁধে জুড়িয়া দিয়া, এক হাতে হুঁকা ও অপর হাতে 'পাঁজাল্' লইয়া বাহির হইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ মাঠে চষবি রে?

'তেলের ডাঙ্গা'য় বাবু। বলিয়া সে চলিয়া গেল। চা খাইয়া আমিও গাঁ-খানা ঘুরিয়া আসিবার জন্য বাহির হইলাম।

প্রথমেই আমার সাত পুরুষের ভিটার ধারে গেলাম। গড় হইয়া সেই খানকার মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া মনে মনে কহিলাম, তুমি স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী। তোমায় ছেড়ে যে মহাপাপ করেছি, তার শাস্তি পেয়েছি, পাচ্চি। তবে মরবার আগে তোমার কাছেই ছুটে আসব জননী।

তোমার কোলেই প্রথম চোখ চেয়েছি, তোমার কোলেই যেন চোখ বুজি।

উঠানের মধ্যে গিয়া, তাহার এক পাশে কত আদরে, কত যত্নে বহুদিন আগে যে 'পেয়ারাফুলি' আমগাছটা পুঁতিয়াছিলাম তাহার তলাকার জঙ্গলগুলি দুহাতে পরিষ্কার করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে বসিয়াছিলাম তাহা জানি না। চমক ভাঙ্গিল—গোষ্ঠর ডাকে—'বাবু, অনেক বেলা হয়েচে যে—ঘরে চলুন।'

ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িলাম। সূর্য্য তখন প্রায় মাথার উপর।

বেলা আটটার সময় বাজারের থলি হাতে করিয়া নারাণদাস বাজার করিতে বাহির হইয়া প্রথমে ঢুকিল দত্তদের দোকানে। দত্তদের ন'বাবু হিসাবের খাতা খুলিয়া বসিয়াছিল ; নারাণ দাস তাহার সামনে আসিয়া কহিল—"আজ যাচ্চেন ত ? একটু সকাল-সকাল যাবেন, নইলে জায়গা পাবেন না। আজকে একবার মোহন-বাগানের খেলাটা দেখবেন। গোটা-চারেক আজ রেঞ্জার্স'কে খাওয়াবে।"

ন'বাবুর কর্ণরন্ধ্রে বোধ হয় কিছু প্রবেশলাভ করিল না ; কাহার একটা হিসাব লইয়া তিনি তদ্‌গত চিত্ত ছিলেন। নারাণদাস কহিল—"আজকের খেলা দেখবার মত হবে। ক'টায় বেরুবেন দাদা ?"

দাদা নিরুত্তর। নারাণদাস দাদার দোকান হইতে বাহির হইয়া বাজারের পথে অগ্রসর হইল। গদাই বিঁড়িওয়ালাকে কহিল—"গদাইচরণ, আজ ক'টা খাওয়াবে বোলে মনে হয় ?"

"কিসের নারাণবাবু ?"

"আরে, আজকের খেলায় ! রেঞ্জার্স কে আজ ঘোল খেতে হবে। যাচ্চিস্ ত ? একটু সকাল-সকাল না গেলে কিন্তু—

গদাইএর খদ্দের আসিয়া পড়ায় সে নারাণদাসের কথায় কর্ণপাত না করিয়া খদ্দের বিদায়ের দিকে মন দিল। নারাণদাস তখন সোজাপথ ছাড়িয়া, বাঁক ঘুরিয়া, গাঙ্গুলীদের বৈঠকখানায় গিয়া হাজির হইল।

বৈঠকখানায় তখন পুরা মজলিস্ চলিতেছিল। নারাণদাস প্রবেশ করিতেই শচীন দাঁড়াইয়া উঠিয়া জোড়হাতে কহিল—

"নারায়ণ ! তব দর্শনাভিলাষে,
আসিলাম বৈকুণ্ঠে ছুটিয়া।
কিন্তু এ কি হেরি রূপ তব প্রভু ?
এক হস্তে তব
বাজারের থলিয়া, অপর হস্তে, দেব !
আধ-পোড়া বিঁড়ি !"

সুরেশ কহিল—"কি রে! How is তোর খোকা? অসুখ সেরেচে?"

নীরেন বলিল—"বিকেলে ভাল গান হবে রে, আসিস্। বোস্, তামাক ready হোচ্চে।"

নারাণদাস কহিল—"তামাক খাওয়ার অবসর নেই, ও বেলা গান শোনবারও অবসর নেই।"

নীরেন কহিল—"অপরাধ?"

"বাজারে যাচ্চি; বাজার গেলে তবে রান্না হবে। আর ও-বেলা মোহনবাগান vs. রেঞ্জার্স।"

"তা ও আর দেখতে কি যাবি? মোহনবাগান তোর আধ ডজন খাবে জেনে রাখ।"

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নারাণদাস কহিল—"কথাটা প্রায়ই ঠিক; তবে একটু উল্টে পড়লো। মোহনবাগান আধ ডজন খাবে নয়—দেবে।"

মহিম কহিল—"যা—যা। ও মোহনবাগান হেরে বোসে আছে।"

নারণাদাস ঝাঁঝিয়া উঠিয়া কহিল—"থাম্, থাম্। খেলার খবর তুই কি জানিস?"

সুরেশ কহিল—"ও না জানতে পারে, তবে সকলেই জানে যে, রেঞ্জার্সের কাছে মোহনবাগান—"

কথা কাড়িয়া লইয়া শচীন কহিল—"তা বোলে আধ

ডজন যে খাবে তা মনে হয় না, গোটা চারেক খেতে পারে।"

নারাণদাস ভিতর-ভিতর বিষম রাগিয়া উঠিল। যদিও তামাকটা দু'এক টান দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই পাপ-স্থানে আর বসিল না। উঠিয়া পড়িল।

নারাণ উঠিয়া দাঁড়াইতেই, মহিমও উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল—"এরা ত খেলার বিষয়ে সব দিগ-গজ। আজকের খেলায়, নারাণদা' যা বোলেচে—রেঞ্জার্স'কে আধ ডজন খাওয়াবে মোহনবাগান।"

নারাণের পিছন-পিছন মহিম বাহিরে আসিয়া কহিল —"নারাণদা, কাল যে-কথাটা বলেছিলুম—সেটা···

"ও! দশটা টাকা ধার? দোবো। কাল হাতে ছিল না ভাই, হঠাৎ এক জায়গা থেকে পেয়ে গেছি। ঘণ্টাখানেক পরে যাস্, হ'বেখন।—ম্যাচে যাচ্চিস্ ত?"

"নিশ্চয়ই। মোহনবাগানের ম্যাচ্, যাবো না!"

"একটু সকাল-সকাল যাস্—নইলে···

"তাহোলে ঘণ্টা খানেক পরে যাব তোমার ওখানে?

"যাস্।" বলিয়া নারাণদাস বাজারের পথে অগ্রসর হইল;

* * *

"চাই—গরমা-গরম ছোলাভাজা মুড়ী।"

"পান সিগারে-ই-ট্ !"

"টাট্‌কা ভাজা, বাবু টাট্‌কা—তাজা !"

"আইস্ ক্রী-ই-ই-ম্ !

চতুঃপার্শ্বে নানা জাতীয় অসংখ্য দর্শকের মধ্যে মোহন-বাগান vsঃ রেঞ্জার্সের ম্যাচ চলিতেছে।

"এই—এই গো……উঃ ! বড্ড বাঁচালে !"

"আরে এত্তে ঠেলিচো কাঁইকি ?"

"নাইস্ ! গুড্ শট্ !"

"ইণ্ডলি মিণ্ডলি চুরাণ্ চঙ্গলু ভেণ্ডি গ্রিরিণ্ডি !"

"আরে ছাত্তা জেরাসে উঁচা কর্য়ো বাবু।"

"রে—রে—রে—রে—রে--রে !"

মোহনবাগানের গোলের দিকে যেখানটায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভীড় জমিয়াছিল, সেইখানে একটা প্যাকিং বাক্সের উপর চ্যাপ্টা হইয়া দাঁড়াইয়া নারাণদাস গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় ক্রমাগত পাগলের মত চীৎকার করিতেছিল—গো অন্ ভট্‌চায—গো অন্ ! গো আন্ !—নাইস্ ! চৌধুরী—সাবাস্ দাদা—কিক্ অন্, শুট—এক্সসে—এ হে-হে-হে-হে ! গো আন্ মুকুজ্যে ! গো আন্ মু… ।—দেহটাকে অসম্ভব রকম ডানদিকে হেলানোর ফলে নারাণদাস বাক্স উল্টাইয়া পড়িয়া গেল এবং বাক্সের কোণা লাগিয়া কপাল হইতে রক্ত গড়াইতে লাগিল। বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না

করিয়া নারাণদাস সঙ্গে-সঙ্গেই আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জামার হাতায় কপালের রক্ত মুছিতে মুছিতে পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিতে লাগিল—"ফাউল! ডাহা ফাউল। কাণা রেফারী কোথাকার!...হ্যাণ্ড ব-অ-অ-ল্! গোঅন্—কেশব, গো অন্। ব্যাক্—টেক্ কেয়ার—এই-ই-ই-ই-ই—ধ্যেৎ!"

মিনিট দুই পরেই বিনা-হাততালি ও কলরবের মধ্যে একটা অস্ফুট রব শোনা গেল—'গো-ওল্।'—অর্থাৎ মোহনবাগান গোল খাইল।

ইহারই মিনিট-খানেক পরে রেফারীর খেলা-সাঙ্গর বাঁশী বাজিয়া উঠিল—ফ্র-র্-র্-র!—মোহনবাগানের হার হইল!

* * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, ম্লান ও গম্ভীর বদনে নারায়ণ গৃহে প্রবেশ করিল। নারায়ণের নারায়ণী—অর্থাৎ স্ত্রী—বিরক্ত স্বরে কহিল—"খোকার মালিসটা এনেছ?"

উত্তর না দিয়া নারাণদাস শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

"আনো নি তাহোলে? বুকে সর্দ্দি বোসে ছেলেটা এইবার মরে যাক্। অত কোরে বলে দিলুম—

তেমনি নির্জ্জীবের মত শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া নারাণ খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার যেন কথা কহিবার শক্তি নাই।

"তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?"

"উঃ! ওঃ-ও-ও! বাবাগো!"

"কি হোয়েচে তোমার? বুকে কোন ব্যথা-ট্যথা আটকালো নাকি?" বলিয়া হেমাঙ্গিনী বুকে তেলে-জলে মালিস করিবার জন্য তাড়াতাড়ি রান্না ঘর হইতে তেল আনিতে ছুটিয়া গেল।

কোন কথা না বলিয়া নারাণদাস ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এক-পা এক-পা করিয়া হাজির হইল—গাঙ্গুলীদের বৈঠকখানায়।

তখন সেখানে বিকালের গানের আসর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তবে শচীন, সুরেশ, নীরেন, মহিম প্রভৃতি অনেকেই ছিল। নারাণদাস টলিতে টলিতে গিয়া সতরঞ্চির একধারে নির্জ্জীবের মত শুইয়া পড়িল।

শচীন লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—"ওরে নারাণের কি হোল—ছাখ—ছাখ।"

সুরেশ তাড়াতাড়ি পাখা আনিয়া জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল; কহিল,—"হবে আবার কি; মোহনবাগান যে হেরেচে"

নীরেন এক বালতি ঘোলা জল আনিয়া নারাণের মাথায় ঢালিতে যাইতেছিল, সুরেশ বারণ করিল, কহিল—"ওতে সুবিধে হবে না। নারায়ণের মাথায় মধ্যম-নারায়ণ মালিসের দরকার। কেউ আনতে পারিস?"

সকালেই টাকা দশটা মহিমের হস্তগত হইয়া গিয়াছিল। মধ্যম-নারায়ণের কথায় সে তখনি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং উঠান হইতে এক তাল কাদা তুলিয়া আনিয়া নারাণের মাথায় মাখাইয়া দিতে দিতে কহিল—"আপাততঃ এই দিশী 'মধ্যম-নারায়ণ'ই চলুক, তারপর দেখা যাবে এখন।"

তখন নারাণ ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া ঘরের কোণের লাঠিগাছটা লইল এবং ক্ষিপ্তের মত সকলের মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অতঃপর— !!!!

অবশেষে উভয়েই উভয়ের প্রেমে পড়িল। কেমন করিয়া এই অঘটন ঘটিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

শ্রীমান্‌টি ছিল ভবানীপুরে ;
শ্রীমতী ছিল কালীঘাটে ;
একদা কোন্ ফাঁকে আলাপ হোল দোঁহে,
সন্ধ্যায় 'লেক'-এর মাঠে।

তখন একদিন সন্ধ্যায় লেকের কুঞ্জবনের তলে বসিয়া মতিলাল বলিল—"তোমাকে না পেলে আমি ঐ সামনের রেল-লাইনের ওপর শুয়ে পোড়ে ট্রেণের চাকার তলায় প্রাণ দেবো।"

সবিতা বলিল—"আর আমি তা হোলে লেকের জলে ডুববো।"

আকাশের প্রান্তে বড় এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছিল।

সেই দিকে চাহিয়া মতিলাল কহিল—"তোমাকে আর একদণ্ড না দেখে আমি থাকতে পারি না, সবু। কি ভাবে যে সারাটা দিন ছট্-ফট্ কোরে কাটিয়ে বিকেলের অপেক্ষায় থাকি, আমিই জানি।"

মতিলালের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সবিতা কহিল—"আমার মনের কণ্ঠে মতির মালা হোয়ে তুমি চব্বিশ ঘণ্টাই ছুলচো। যখন চোখের সামনে তোমাকে পাই না, তখন চোখ বুজ্‌লেই তোমাকে পাই।"

দিন দুই পরে একদিন দুপুরবেলা মতিলাল অতিমাত্রায় কাতর হইয়া ভূপেনের বৈঠকখানায় ঢুকিল ও পাখার সুইচটা টিপিয়া দিয়া তক্তাপোষের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল—"উঃ!"

ভূপেন সম্পর্কে তাহার জ্ঞাতি ভাই। বয়সে ৫।৭ বৎসরের বড়। ভূপেন কহিল—"কি হোল রে মোতে? ও-রকম কোরে শুয়ে পড়্‌লি কেন?"

"উঃ! গেলুম ভূপি-দা!"

"বেশ-ই ত ছিলি; আবার তোর বুক ধড়-ফড়ানী আরম্ভ হোলো না কি?"

বুক চাপিয়া ধরিয়া, চক্ষু বুজাইয়া, মতিলাল কহিল—"ভয়ানক! বাঁচাও ভূপি-দা,' বাঁচাও!"

"নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না! তোর

বিয়ের ত সব ঠিক্ঠাক্ কোরে ফেলেচি। সেই পদ্মরাণী মেয়েটিকে একদিন—

"আরে রাম রাম! সেই জঘন্য মেয়েটাকে—। তোমরা যে কী-ঈ ঈ—"

"তা তুই আর কোন মেয়েকে পছন্দ-টছন্দ কোরে থাকিস্ যদি ত খুলে বল্ না; খুড়ীমাকে বোলে আমি রাজী করাব এখন।"

লাফাইয়া উঠিয়া মতিলাল কহিল—"তাই করাও ভূপি-দা', নইলে আমি প্রাণে বাঁচবো না। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি…।"

"তোর পছন্দ হোয়েচে?"

"খুব।"

"স্বভাব-চরিত্র বা দেখতে-শুনতে ভাল ত?"

"একেবারে অতি চমৎকার।"

"একে যোগাড় করলি কোত্থেকে? নাম কি মেয়েটির?"

"সবিতা। সবিতাকে না পেলে ভূপিদা' আমি আত্মহত্যা করব! তোমার পায়ে পড়ি ভূপিদা'…"

পায়ে পড়ার বদলে, মতিলাল ভূপেনের হাত দুইটা জাপ্টাইয়া ধরিয়া তাহার বাকী কথাগুলো সকাতর চাহনি দ্বারা প্রকাশ করিল।

বিধবা মায়ের মতিলাল একমাত্র সন্তান। ভূপেনের সাহায্য ও পরামর্শ না লইয়া মতির মা কোন কাজই করেন না। ধরিতে গেলে ভূপেনই ও-বাড়ীর অভিভাবক। ভূপেন বলিল—"তোকে কোন-এক জায়গায় গছিয়ে দিতে পারলে, তুইও বাঁচিস্, আমরাও বাঁচি। আচ্ছা, খুড়ীমাকে বোলে-কোয়ে রাজী করাবো এখন।"

মতিলাল প্রফুল্ল মনে ভূপেনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রস্থান করিল।

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পরে আবার মতিলাল সেদিনের মতই নির্জীব ও কাতর হইয়া আসিয়া ভূপেনের তক্তা-পোষের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

ভূপেন কহিল—"আবার ও রকম কোরে পড়লি কেন? খুড়ীমাকে ত সব কথা বলিচি। তাঁর ত মত হোয়েচে। সেই সবিতা মেয়েটি···।

"ছাড়ান্ দাও ভূপি-দা। ও আর দরকার নেই।"

"আবার কি হোল রে?"

"আরে, অতি জঘন্য—অতি জঘন্য! যেমন রূপ, তেমনি গুণ! যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই! ন্যাস্‌টি!"

মৃদু হাসিতে হাসিতে ভূপেন কহিল—"তোকে নিয়ে দেখচি মহা মুস্কিল হোল, মোতে!"

বুকটা চাপিয়া ধরিয়া মতিলাল কহিল—"এইবার

ভূপি-দা', মুস্কিলের আসান্ হ'বে তোমাদের। এইবার ঠিক মরব! উঃ!"

"আবার বুক-ধড়্‌ফড়ানী সুরু হোল না কি? হ্যাঁরে মোতে?"

"না ভূপি-দা', আমার কিছু হয়নি। আমার শরীর খুব ভাল আছে; আর মোরে না-যাওয়া পর্য্যন্ত খুব ভালই থাকবে। উঃ!"

"তুই মরবার আগে, তোকে নিয়ে যে আমরাই মলুম! তা, আর কোনো মেয়ে-টেয়ে ঠিক-ঠাক্ কোরেছিস্ নাকি? সব কথা খুলে বলবি। করেছিস্?"

মতিলাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে—করিয়াছে।

ভূপেন কহিল—"এ মেয়েটি তোর সত্যিই পছন্দ ত?"

"একে না পেলে আমি নির্ঘাৎ বিষ খাবো, এটা ঠিকই জেনো।"

"এর নামটি কি?"

"লাবণ্য। বালীগঞ্জে বাড়ী। তার বাপ-মায়েরও আমাকে খুব পছন্দ হোয়েচে।"

"পছন্দ ত হবারই কথা। তা, হ্যাঁরে মোতে, এত সব যোগাড় কোরে ফেলিস্ কোত্থেকে? তোর বাহাদুরী আছে।"

একটু নীরব থাকিবার পর মতিলাল কহিল—"আমার

শুধু একলার বাহাত্বরী নয় ভূপি-দা,' ও-পক্ষেরও বাহাত্বরি !" বলিয়া মতিলাল বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"উঃ ! বুক গেল রে বাবা !"

* * *

বালীগঞ্জ।

লাবণ্যদের বাটী।

মতিলাল লাবণ্যর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—"যুগে যুগে তুমি আমারই, আমি তোমারই, লাবু——ছিলুম, আছি এবং থাকবো।"

প্রশান্ত আনন্দভরে লাবণ্য কহিল—"স্বপ্নরাজ্যের ভেতর এতদিন আমরা হু'জনে হু'জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। জীবনের এক শুভতম ক্ষণে হু'জনে হু'জনকে পেয়ে গেলুম।—মা আসচে।"

লাবণ্যর মা হুই হাতে হুই কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"চা খাও, বাবা। কর্ত্তা তোমার টাকা হু'শো পেয়ে কী আহ্লাদ ! বলছিলেন, হু'দিন পরে আমার জামাই হবে বটে ; কিন্তু ও আমার জামাই ত নয়, আমার ছেলে।—হ্যাঁ বাবা মতিলাল, টাকা যে দিলে, তোমার মা রাগ্-টাগ্ ত করবেন না ?"

চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে মতিলাল কহিল—"মা ত জানে না। আর ও টাকা ত আমার নিজের।"

"সুখে থাক বাবা। লাবু, চা খাওয়া হোলে মতি-লালকে পাণ এনে দিও"—বলিয়া লাবণ্যর মা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

"লাবু, পান্নার দুল-জোড়াতে তোমার সুন্দর মুখখানা আরও যে কত সুন্দর দেখাচ্চে, তা আর কি বোলবো!"

"৭০ টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেচো, ভালো হবে না? তা এ-পেত্নীর জন্যে অতগুলো টাকা—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মতিলাল কহিল—"অতগুলো টাকা? যদি ইন্দ্রের মতো স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হতুম, তা হোলে সে-স্বর্গরাজ্যও তোমার জন্যে অকাতরে আমি দিতে পারতুম, লাবু।"

মতিলালের প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে আনন্দের ঢেউ তুলিয়া দিয়া লাবণ্য পাণ আনিতে উঠিয়া গেল।

*   *   *

আজ ২০শে।

২৬শে শ্রীমতী লাবণ্যর সহিত শ্রীমান মতিলালের শুভ-বিবাহ।

কিন্তু বেলা ৫টা ৪৭ মিনিটের সময় মতিলাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় বহুকালের রুগীর মত টলিতে টলিতে বাহির হইতে আসিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

প্রভেদের মধ্যে এবার তাহার নিজের বাড়ী এবং নিজের শয্যা। এবং এবার চিৎ নহে—উপুড়।

নীচের দালানে তখন ভূপেন আসিয়া মতিলালের মাতার সহিত কি-সব কথা কহিতেছিল। মতিলালের অবস্থা দেখিয়া, ভূপেন তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কী হোল রে, মোতে?"

"শীগ্‌গীর একজন ডাক্তার আনো ভূপি-দা'; বোধ হয় হার্ট-ফেল্ হোয়ে যেতে পারি!"

"কেন? আবার তোর হোল কি? এই ক'টা দিন বাদেই ত—।"

কম্পিত কাতরকণ্ঠে মলিলাল কহিল—"সে আর হবে না, ভূপি-দা!"

"হবে না মানে?"

"হবে না মানে—হবে না! সে আর একজনকে বিয়ে করে ফেলেচে!"

"বলিস্ কি রে!"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমি সেই গানের মাষ্টার ব্যাটাকে যদি না খুন করি ত আমার নাম মতিলাল নয়।" উত্তেজিত হইয়া মতিলাল ঘুসি পাকাইয়া উঠিয়া বসিল।

কয়েক সেকেণ্ড নির্ব্বাক থাকিবার পর ভূপেন

কহিল—“নাঃ! তোর বিয়ে নিয়ে দেখচি মুস্কিলেই পড়া গেল! একেবারেই যাকে বলে—হোপ্‌লেস্।”

কিন্তু ভূপেন যাহাই বলুক না কেন, হোপ্‌লেস্ কিছুতেই নয়। কারণ, তিনি চারদিন পরেই দেখা গেল, সিনেমা-হাউসের সামনে, মতিলাল আর একটি তরুণীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং দু'জনেরই চোখে-মুখে হাসি ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে।

স্বামী অহিংসানন্দ

সকাল বেলাতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল।

উপলক্ষ্য—কই মাছ।

স্বামী শ্রীযুত হরিদাস, স্ত্রী-শ্রীমতী রাজবালার মুখের দিকে কট্‌-মট্‌ করিয়া চাহিয়া থাকিবার পর ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিলেন—"এ-বাড়ীতে ওসব কিছুতেই চলবে না।"

এ বছর আম্র ফল সুলভ হওয়াতে হরিদাস নিজের আহার সম্বন্ধে, অন্নব্যঞ্জনের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া উক্ত ফলের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করাতে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আমাশয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পড়েন। ডাক্তারে বিধান দেয়—প্রাতে কই মাছের ঝোল, রাত্রে বেলশুঁঠ দিয়া বার্লী। সেই বিধান অনুযায়ী আজ সকালে রাজবালা চাকর বৃন্দাবনকে দিয়া বাজার

হইতে বড় বড় কই মাছ আনাইয়াছিল। তারপর কলতলার ধারে বসিয়া, একরাশ ছাই সংযোগে যখন রাজবালা আঁশ-বঁটির বাঁটের আঘাতে একটি একটি করিয়া সেগুলির মাথা থেঁত্লাইতেছিল, তখন উপরের বারান্দা হইতে হরিদাস তাহা দেখিতে পান এবং এই মহা হিংসার কাজে প্রাণে আঘাত পাইয়া অকুস্থলে ছুটিয়া আসেন ও রাজবালাকে বহুবিধ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন।

অবলা হইলেও, স্বামীর গোটাকতক বাক্য বাণ খাইবার পর, রাজবালাও বিষ বাষ্প ছাড়িল। কহিল—"বেশী কিছু পাপ হবে না। তুলসী কাঠের বঁটির বাঁট, আর শিব-পূজো হয়েছিল, তারই সেই হোমের ছাই। সুতরাং 'কৈ' সগ্গে যাবে ; তাতে পুণ্যই হবে।"

তারপরই তুমুল কাণ্ড। বারুদ, বোমা, তর্জ্জন-গর্জ্জন, লম্ফ-ঝম্ফ। শেষকালে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া হরিদাস কহিলেন—"খবরদার! বলে রাখচি, এ বাড়ীতে ও-সব কিছুতেই চলবে না।"

আহারের সময় হরিদাস মাছে হাত দিলেন না। তাদের আত্মা ইতিপূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছিল, এখন নশ্বর দেহগুলি ঝোলের বাটিতেই পড়িয়া রহিল। হরিদাস ঝোলটুকু এবং বাছিয়া বাছিয়া পটল, আলু ও কাঁচ-কলা

খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এই নৃশংস এবং হিংস্র কার্য্যের জন্য তিনি ব্যথিত অন্তরে সমস্ত দিন ধরিয়া নারায়ণের জপ করিলেন, তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিলেন এবং মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন—আগামী কল্য অনশনে কাটাইবেন।

পরদিন প্রাতে হরিদাস বৃন্দাবনকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওদের বল্ গিয়ে যে আজ আর আমি সমস্তদিন কিছু খাব না; শরীর খারাপ।"

বাড়ীতে জীবহত্যার জন্য হরিদাস শুধু একদিন অনশনে থাকাই স্থির করেন নাই। অনশন, গঙ্গা স্নান এবং তিনদিন রাজবালার সহিত বাক্য বন্ধ।

সুতরাং বৃন্দাবনের মারফত না-খাইবার কথাটা বলিয়া দিয়াই তিনি গামছা ও কাপড় লইয়া গঙ্গা স্নানে যাত্রা করিলেন।

রাজবালা বৃন্দাবনকে ডাকিয়া কহিল—"গঙ্গাচ্চানে গেলেন, ফিরতে তাহোলে ঘণ্টা দুই। শীগ্গীর খাটের মশারীটা খুলে নিয়ে আয়, বাবা।"

"কেন মা?"

সাংঘাতিক ছারপোকা হয়েছে। রাত্রে মোটেই ঘুমোবার জো নেই। শীগ্গীর নিয়ে আয়; এইবেলা পটা-পট্ কোরে মেরে ফেলি।"

বৃন্দাবন মশারীটা খুলিয়া আনিল। রাজবালা সব কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছারপোকা মারিতে বসিল।

"ওরে বেন্দা দেখ্—দেখ্। কী কাণ্ড দেখ! একেবারে ছারপোকার গাঁদি জমে রয়েচে! হবে না? মোটে মশারীতে হাত দিতে দেবে না!"

"মারো মা, পটাপট্ মারো। আমিও এইবেলা আমার ঘরের আরশোলাগুলো মারি গে। কী আরশোলাই হয়েচে মা! দু'শো পাঁচশো হাজার হবে! সারা রাত গায়ের ওপর যেন চোষে বেড়ায়! নাকের ভেতর চলে যায়, কাণের ভেতর ঢুকে পড়ে!"—বলিয়া বৃন্দাবনও একগাছা মুড়া-ঝাঁটা লইয়া, তাহার সিঁড়ির নীচেকার ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে প্রবেশ করিল।

* * *

গঙ্গা স্নানের উদ্দেশে খানিকটা পথ আসিয়াই হরিদাসকে ফিরিতে হইল; তাড়াতাড়ি মণি-ব্যাগটা লইতে ভুলিয়াছিলেন। কিছু পয়সা-কড়ির দরকার। সুতরাং তিনি ফিরিলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সাংঘাতিক ব্যাপার! অমানুষিক কাণ্ড! জীবহত্যার একেবারে ধুম লাগিয়া গিয়াছে। দালানে ছারপোকার পটাপট্! সিঁড়ির ঘরে আরশোলার ঝটাপট্!

আর গঙ্গা স্নানে যাওয়া হইল না। কাহাকেও একটি কথা না বলিয়া শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন এবং ঘণ্টা-খানেক নীরবে বিছানায় কাত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বিছানা-পত্র ও ট্রাঙ্ক গুছাইয়া লইয়া বৃন্দাবনকে দিয়া একখানা ট্যাক্সি আনাইলেন এবং এই পাপস্থান পরিত্যাগ করতঃ ট্যাক্সিতে আসিয়া বসিলেন।

ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া কহিল—"কাঁহা যানে হোগা বাবুসাব ?"

গাড়ীর 'সীট'-এ শিথিলভাবে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া হরিদাস কহিলেন—"চলো—যাঁহা খুসী। হাওড়া টিস্‌ন্‌মে চলো। নেই নেই—হাওড়া নেই ; কালীঘাট চলো।"

ট্যাক্সি কালীঘাট অভিমুখে ছুটিল।

* * *

কালীঘাট। হরিদাসের বাসা। সময় প্রাতঃকাল।

ঠিকা চাকর নন্দলালের কাছ হইতে হরিদাস বাজারের হিসাব লইতেছিলেন ; কহিলেন—"মাগুর মাছ জ্যান্ত আনো নি ত ?"

"আজ্ঞে না বাবু ; আধ-মরা দেখে এনেচি।"

হরিদাস লাফাইয়া উঠিলেন,—"আধ-মরা ! বাকী অর্দ্ধেক প্রাণ কি এই বাড়ীতে বার করবে ? ও-সব হিংসের কাজ টাজ———"

"আজ্ঞে না বাবু। বাকী অর্দ্ধেক প্রাণ পথে আনতে আনতেই হোয়ে গেছে।"

হরিদাস স্থির হইলেন।

নন্দলাল কহিল—"মরা মাগুর, তাই সের নিয়েচে—চৌদ্দ আনা। যাত্রীর ভিড় কি না, মাছটা এ বাজারে বিষম আক্রা।"

"মাছের বদলে অন্য কিছু আনলে হয়।"

"অন্য কিছু?"

"হ্যাঁ।"

"মাংস ?"

"হ্যাঁ।"

"তাই আনবো বাবু। পাঁঠার ত ?"

"আরে না—না—না—না——"

"বাজারে কচ্ছপের মাংস আসে, তাই সের-খানেক—"

"আরে রাম-রাম ! ও-সব নয়। তোমার গিয়ে এ-র মাংস বলচি। বেশ নধর দেখে——বুড়ো না হয় ;——— এ বাজারে না পেতে পার। লেকের বাজারে খুব পাবে। বেশ বাচ্ছা দেখে,—আনা পাঁচের ভিতরেই একটা হবে।"

"মুরগীর কথা বলচেন ?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ।"

এক গাল হাসিয়া নন্দলাল বলিলেন—"ওবেলা আনবো বাবু।"

"কিন্তু বাড়ীতে এনে মারা চলবে না। এখানে যেন জীবহত্যা না হয়। একেবারে ঐখান থেকেই———"

"জবাই কোরে কেটে-কুটে 'কম্‌পিলিট কোরে নিয়ে আসবো।"

বৈকালের দিকে 'কম্‌পিলিট' করিয়া আনিবার জন্য নন্দলাল লেক-মার্কেটে চলিয়া গেলে, পাড়ার দুই-চারিজন ভদ্রলোক হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

বিজয় হালদার কহিলেন—"শরীরটা ভাল আছে ত হরিবাবু ?"

জ্ঞান মুখুজ্যে কহিলেন—"তামাকের পাট ত আপনার নেই। সিগারেটের কেস্‌টা দিন।"

সুরেশবাবু কহিলেন—"দিন পনর ত কাটলো; কোন অসুবিধে বোধ কচ্চেন না ত ?"

একটু সৌজন্যের হাসি হাসিয়া হরিদাস কহিলেন—"অসুবিধে বিশেষ কিছু যদিচ হচ্চে না, তবে বাড়ীটায় ভয়ানক ছিটকে ইঁদুরের উপদ্রব।"

জ্ঞান মুখুজ্যে উপদেশ দিলেন—"কল কিনে আনবেন। রোজ রাত্রে পেতে রাখলেই আর—

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হরিদাস কহিলেন—"কল পেতে ইঁদুর মারা! মাপ করবেন। জীবহত্যার ওপর আমি ভয়ানক চটা। একটু আগে কাদের একটা বেড়াল আমার ঐ পাশের ঘরটায় ঢুকে একটা ইঁদুর ধরে মেরে ফেল্‌লে; রাগে আমার সর্ব্বশরীর রি-রি কোরে উঠলো। তিনটি মুগুরের ঘায়ে বেড়াল-বাছাধনকে দিলুম একেবারে সাবাড় কোরে।"

বিজয় হালদার চমকিত হইয়া কহিলেন—"সাবাড় কোরে দিলেন! নেড়া-পঞ্চুর বেড়াল নয় ত ?"

"নেড়া-পঞ্চু কে ?"

সুরেশবাবু কহিলে—"এই, আপনার পেছনের বাড়ীর। ভয়ানক হুঁদে লোক। তার বেড়াল যদি হয়, তা হোলেই ত———। আচ্ছা, তার গায়ের রংটা কি রকম বলুন ত ?"

"কালো।"

"মাঝে মাঝে হল্‌দের ছাপ আছে ত ?

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ গোল-গাল, মোটা-সোটা ?"

"হ্যাঁ ; ঐ ডাষ্টবিনের ভেতর পড়ে রয়েচে।"

তখন সকলে ডাষ্টবিনের ধারে গিয়া দেখিলেন এবং দেখিয়াই সচকিত চাহনিতে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া এবং আর হরিদাসের গৃহে না ঢুকিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইহারই ঘণ্টাখানেক পরে, নেড়া-পঞ্চু মাল কোঁচা বাঁধিয়া এবং একগাছা মোটা খেঁটে গোছের লাঠি হাতে লইয়া দ্রুত পদে এইদিকে আসিল এবং একবারটী ডাষ্টবিনের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া, ক্ষিপ্তের মত হরিদাসের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহার পর যে ব্যাপার ঘটিল, তাহার ফলে, হরিদাসের মনের মধ্যে ও গৃহের মধ্যে প্রবাহিত অহিংসার প্রবল স্রোত তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া

ফেলিল—নিকটস্থ 'শেঠ হরকিশনলাল হস্পিট্যালে'র একটি 'বেডে'র উপর।

গভীর রাত্রে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে, ডাক্তার বলিলেন—"মাথার আঘাতটা কিন্তু আপনার গুরুতর নয়। গুরুতর হোয়েচে—পায়ের আঘাত। হাঁটুর হাড়টা বোধ হয় যেন ভেঙেচে।"

অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

চিনিবাস

বহুদিন পরে দেশে আসিয়াছি।

যে গ্রামকে একদিন অবহেলায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম, কিছুদিন হইতে তাহার একটা স্নেহ-সকাতর ডাক মাঝে মাঝে কাণে এসে লাগিতে সুরু করিয়াছিল। তার সেই মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, তার সেই বন-উপবন, ছেলেবেলার সেই সব চির-পরিচিত বৃক্ষরাজী, তার সেই আঁকা-বাঁকা নদী—'যশোদা,' তার রৌদ্র, তার ছায়া, তার আকাশ, তার বাতাস, সব যেন একজোটে মনের মধ্যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

এক শরতের অপরাহ্ণে, তাই দেশের মাটিতে ছুটিয়া আসিলাম। আসিয়া মনে হইল, গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর—এই বিশ বাইশ বৎসর সময়টা জীবনের খাতা হইতে যেন মুছিয়া গিয়াছে। মনে হইল, যেন চিরকালই এখানে আছি, চির কালই থাকিব। একটা মস্ত অভিসম্পাত তুল্য সহরবাসের এই বিশ-বাইশ বৎসর সময়টা, মনের উপর তাহার সমস্ত প্রভাব হারাইয়া যেন ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

সপ্তমীর সন্ধ্যায় চক্রোবর্ত্তীদের পূজার চণ্ডীমণ্ডপে

বসিয়া, প্রতিমার দিকে চাহিয়া মনে হইল—মা যেন আমার কত পরিচিত। এই সাতান্ন বৎসরই যেন মাকে এইখানে এইভাবে বর্ষে বর্ষে দেখিয়া আসিতেছি; একটি বছরও যেন সে-দেখায় বাদ পড়ে নাই। সেই কোলাহল, সেই লোক জন, সেই আলোকমালা, সেই উৎসব, সেই হাঁক-ডাক—এ সবের থেকে একটি বছরের জন্যও যেন আমি বিচ্ছিন্ন হই নি।

বসিয়া বসিয়া মনে পড়িল অনেকদিনের অনেক কথা। সেই অনেক কথার মধ্যে একটি কথা মনের মধ্যে বড় হইয়া জাগিল। সেইটাই আজ বলিব।

বছর চল্লিশ হইবে। আমরা তখন 'গঙ্গাতীরে'র হাই স্কুলে পড়ি। হুগলী জেলার ওই অঞ্চলটার মধ্যে, 'গঙ্গাতীর' তখনকার দিনে খুব বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। গঙ্গাতীরের সরকার বাবুদের সুনাম সে সময় তল্লাটের লোকের মুখে মুখে। বহু দেবালয়, অতিথিশালা, জলাশয়, রাস্তা-ঘাট তাঁহাদের অর্থে নির্ম্মিত।

আমাদের জুড়নগাঁ হইতে গঙ্গাতীরের স্কুল দুই ক্রোশ পথ ব্যবধান। মধ্যে যে দুই একখানি গ্রাম আছে তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং নগণ্য। জুড়নগাঁ গঙ্গাতীরের পথে যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে ছোট একটি নদী পড়ে, তাহার নাম—'যশোদা'। এইখানে যশোদার উপর

একটি পাকা সেতু আছে। সেতুর ওপারেই পাঁচপুকুর নামে ক্ষুদ্র একটি সদ্‌গোপের গ্রাম। তারপরই পথের উভয় পার্শ্বে কোথাও বেগুন ক্ষেত, আখের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত; আবার কোথাও বা বিস্তীর্ণ পতিত ভূমি। আবার তাহারই পর হয় ত দুই চারি ঘর নিম্নশ্রেণীর লোক খানিকটা স্থান ব্যাপিয়া কুঁড়ে-কাঁড়া বাঁধিয়া বাস করে।

আমাদের গ্রাম হইতে পোয়া-পাঁচেক দূরে এই রকম একটা স্থানে, খান দশ-পনর ঘর লইয়া ক্ষুদ্র একটি পল্লী ছিল। সেখানটার নাম—ভুঁইপাড়া। আমাদের স্কুলে আসিবার পথে, এই ভুঁইপাড়া ছিল আমাদের **Halting Station.** এই দিক হইতে কয়েকটি যে ছেলে আসিত, তাহাদের সঙ্গে ভুঁইপাড়াতে আমরা মিলিত হইতাম।

কোনদিন তাহারা আগে আসিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিত, কোনদিনবা আমরা আগে আসিয়া তাহাদের জন্যে অপেক্ষা করিতাম। তারপর দুইদল একত্র হইয়া স্কুল যাইতাম।

আমাদের বসিবার স্থান ছিল—পথের ধারের একটি প্রাচীন বটগাছের তলা। স্থানটি অতি মনোরম। সম্মুখে 'গাবাড়ীর মাঠ' নামে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। অনেক দূরে, প্রান্তরের এক পাশ দিয়া 'যশোদা' আঁকিয়া

বাঁকিয়া বহিয়া গিয়াছে। পথের এ-ধারে যেখানটায় আমরা বসিতাম, ঠিক তাহার পাশেই প্রকাণ্ড এক জলাশয়। কতদিনের কাটানো জলাশয়, কিন্তু তখনো খুব গভীর এবং তাহার স্ফটিকের মত জলটি তখনো তক্ তক্ করিত। কবে কোন্ যুগে কোনও ধনী জমিদার না কি এই জেলার বিভিন্ন স্থানে, পথের ধারে, একশত আটটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিয়াছিলেন; ইহা তাহারই অন্যতম।

ভূঁইপাড়ার ওই বটতলায় প্রত্যহই এক বৃদ্ধের সহিত আমাদের দেখা হইত। তাহার নাম চিনিবাস। চিনিবাস নিত্যই একটি ছোট ছেলেকে লইয়া, আমাদের আসিবার পূর্ব্বেই, গাছতলায় আসিয়া হাজির থাকিত। সূর্য্যোদয়ের মতই তাহার আগমন ধ্রুব ছিল। সে তাহার বছর-তিনেকের পৌত্রটিকে এই সময়ে এইখানে আনিয়া নানারূপ খেলা দিয়া, ভুলাইয়া রাখিত।

প্রত্যহ চিনিবাসের সহিত সাক্ষাতের ফলে, আমাদের সহিত তাহার আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সংসারে এই শিশু পৌত্র ও পুত্রবধূ ছাড়া চিনিবাসের আর কেহই ছিল না।

শিশুটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা অনেক কথাই কহিতে শিখিয়াছিল। তাহার নানাবিষয়ের নানারূপ প্রশ্নে

চিনিবাসকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইত। নাতি ঠাকুর্দ্দায় প্রশ্নোত্তর হইত—

ওতা কি ?

ওটা মোষ।

কি কলে ?

মোষ লাঙ্গল টানে, গাড়ী টানে।

গায়ি তাপ্‌বো।

বড় হোয়ে, গাড়ী চেপে বে করতে যাবে, ভাই।

কি দাক্‌তে ?—কু-ক্—কু-উল্, কু—ক্—কুউল্ !

পাখী ডাকচে। বসন্ত-বাউরী পাখী। বলচে—'কেষ্ট গোকুলে !—কেষ্ট গোকুলে !

গোতুলে—গোতুলে !

হ্যাঁ ভাই, গোকুলের কথা এখন তোমার মনে-টনে কিছু পড়ে ত ?

পলে তো।

তুমি ত আমার নীলমণি ভাই, তুমি যে গোকুল থেকে এসেচ।

বলিয়া চিনিবাস তাহাকে বুকে জাপ্‌টাইয়া ধরে।

কখনো বা খোকাটি পিছন হইতে বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া বলে,—ধুক্ কুম্‌মো কয়ো !—অর্থাৎ তাহাকে পিঠে করিয়া ইতস্ততঃ

বেড়াইতে হইবে এবং হাঁকিতে হইবে ধুস্-কুমড়ো চাই গো! ভাল ধুস্-কুমড়ো!

নাতির এই অসুবিধাজনক প্রস্তাবটিকে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে চিনিবাস হয় ত তাড়াতাড়ি বলে,—হ্যাঁ ভাই, এই বাবুদের সঙ্গে তুমি স্কুলে যাবে কি? তোমাকে তালপাতার 'পাত্‌তাড়ী' বানিয়ে দোবো; তুমি অ নিখবে, আ নিখবে, ক নিখবে! যাবে স্কুলে ভাই?

কিন্তু খোকা 'ধুক্-কুম্‌মো'র কথাটা আর কিছুতেই ভুলে না। তাহার বার বার তাগাদায় চিনিবাসকে অস্থির হইতে হয় এবং অবশেষে তাহাকে পিঠের উপর ধুস্-কুমড়ো করিয়া খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরাইয়া আনিবার পর তবে সে রেহাই পায়।

আমাদের উদ্দেশে চিনিবাস কহিত, কি করি বল। বড্ড দুষ্টু। এই সময়টা ওকে নিয়ে একটু বাইরে না এলে, ওর মাকে কি আর রাঁধতে-বাড়তে দেয়! ও শালাও বেশ মজা পেয়েচে। আমাকে ও যেন 'বাহন' মনে করেচে। উদয়াস্ত ওর জ্বালায় কি আমার একটু জিরেন আছে! সেই সন্ধ্যার পর ঘুমুলে তবে আমার রেহাই।

পূজার ছুটীর দিন পনর আগে একদিন আমাদের বটতলায় চিনিবাস গরহাজির হইল। পরদিনও তাহার দেখা পাইলাম না। নিশ্চয়ই তাহার অসুখ করিয়াছে।

আহা, বুড়া মানুষ! এ বয়সে হঠাৎ অসুখে পড়িলে, সেইটাই প্রায় শেষ অসুখ হইয়া দাঁড়ায়। চিনিবাস বলিত, তাহার বয়স তিনকুড়ি ছাড়াইয়া দেড় গণ্ডা হইয়াছে। অর্থাৎ ৬৬ বৎসর। অবশ্য খুব বুড়া না হইলেও, শোকে-তাপে তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। একদিক দিয়া দেখিলে, তাহার পক্ষে এখন মরাই মঙ্গল। কারণ, তাহার সকল বন্ধনই একটি একটি করিয়া নির্দ্দয়ভাবে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে নিজেও আমাদের সামনে কতদিন বলিয়াছে যে, তাহার মরণ হইলেই সে বাঁচে। কিন্তু তাহা হইলেও খোকার কচি বাঁধনে সে নূতন করিয়া আবার বাঁধা পড়িয়াছে। সুতরাং মুখে ঐ কথা বলিলেও, অন্তরে হয়ত বলে না। খোকাকে ছাড়িয়া সে হয়ত এখন মরিতে চাহে না, মুখে যাহাই বলুক না কেন। কিন্তু শমন ত কাহারো ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারে না। হয়ত এই অসুখেই এবার চিনিবাসকে তাহার ৬৬ বছরের জীর্ণ আটচালাখানি ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতে হয়!

একে একে আরও দিন কয়েক কাটিয়া গেল। চিনিবাসকে আর আমরা দেখিতে পাই না, কিম্বা তাহার কোন খবরও পাই না। যেদিন আমাদের পূজার ছুটী হইবে, সেই দিন দূর হইতে দেখি, চিনিবাস বটতলায়

একাকী তাহার শীর্ণ হাঁটু দুটি উঁচু করিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছে। চেহারা রুক্ষ, শুষ্ক, জীর্ণ, দুর্ব্বল। খোকাকে কোলে করিয়া আনিতে ক্ষমতায় কুলায় নাই।

কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খোকাকে আনোনি যে? উত্তর না দিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হোয়েচে চিনিবাস?

কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল, আনবো কি কোরে গো! সে কি আর আছে বাবু! সে যে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে!

জিজ্ঞাসা করিলাম, অসুখ ত তোমারি হোয়েছিল?

তা হোলে ত ভালই হোত। আমার কিছু হয়নি, বাবু। তারই অসুখ করেছিল; পাঁচদিন ভুগে দাদা আমার—

আর কিছু সে বলিতে পারিল না। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ রাখিয়া অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল।

আমরা নির্ব্বাক হইয়া কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিলাম। কাহারো মুখ হ'তে আর কোন কথাই বাহির হইল না।

আজ এতদিন পরে, চল্লিশ বছর আগেকার এই কথাটাই চক্কোবর্ত্তীদের পূজার দালানে বসিয়া বার বার মনে পড়িতে লাগিল।

সরিষার তৈল	...	/১।•	...	৷/১০
লবণ	...	/৷৵০	...	৻১৭৷
আটা	...	/২৷•	...	।৵০
লঙ্কা	...	...	...	৻১৫
মিছরী	...	...	...	/১৫
মিঠে-কড়া তামাক		...	...	৻১০
গুড়	...	/১।০	...	৶১৫
				১৷৶ ৻২৷

পাঁচকড়ি নন্দীর মুদীখানা দোকান হইতে শ্রীনাথ উক্ত দ্রব্যগুলি লইল এবং হিসাব জুড়িল ; দেখিল মোট ১৷৶৻২৷ হইয়াছে। কহিল—"৮৷৻১৭৷ আমায় ফেরত দিতে পারবি ত রে হলা ? আমি দশ টাকার নোট্ দেবো।"

হলধর—পাঁচকড়ি নন্দীর মেজ ছেলে। সকালবেলায় সে-ই দোকানে বসে। হলধর কহিল—"নোটের চেঞ্জ ! তা হোলেই মুস্কিলে ফেল্‌লেন ঠাকুর মশাই। মোটে তিনটা টাকা ত'বিলে আছে ; চেঞ্জ ত হয় না।"

একটু বিজ্ঞের মত শ্রীনাথ কহিল—"খুব হয়। ঐ

তিনটেই এখন দে, বাকী ৫॥ ৫১৭॥ সন্ধ্যাবেলা দিলেই হবে ; আমার ত আর এখনি সব চাই না—” বলিয়া টাকা তিনটা হলধরের কাছ হইতে লইয়া সোজা-পাকে ট্যাঁকে গুঁজিল। কিন্তু উল্টা-পাকে নোট্ খুলিতে গিয়া দেখিল, নোট্‌খানা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং হলধরের উদ্দেশ্যে কহিল—“নোট্‌খানা আন্‌তে ভুলে গেছি রে হলা, এগুলো রেখে আসি, আর নোটখানা নিয়ে আসি।”

হলধর কহিল—“বেশী যেন দেরী করবেন না, ঠাকুর মশায় ; সকাল বেলাটা খদ্দেরের সময়, টাকাকড়ি···”

বাধা দিয়া শ্রীনাথ জিনিষগুলা হাতে তুলিয়া লইতে লইতে কহিল—“বলি, আমার বাড়ী ত লক্ষ্ণৌ-ডিল্লী নয়, আর দশ-বিশ কোশ তফাতেও নয়। এইটুকু যাবো, জিনিষ ক’টা রাখবো, আর নোটখানা···।” দোকান হইতে নামিয়া হন্‌-হন্ করিয়া শ্রীনাথ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল ; তাহার মুখের বাকী কথাগুলা সুতরাং হলধরের কর্ণগোচরই হইল না।

খরিদ্দারের ভীড়ে আর কাজের গোলমালে হলধরের মনেই পড়ে নাই যে, শ্রীনাথ ঠাকুর নোট দিয়া যায় নাই। অনেক বেলায় দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় কথাটা তাহার মনে পড়িল, এবং বরাবর

শ্রীনাথের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল; শ্রীনাথ তখন স্নানান্তে পূজায় বসিয়াছিল। সুতরাং বার-কতক বৃথা ডাকাডাকির পর হলধরকে ফিরিয়া যাইতে হইল।

সন্ধ্যার সময় শ্রীনাথ একটু যেন রুষ্ট হইয়াই নন্দীদের দোকানে আসিল। এ-বেলা স্বয়ং পাঁচকড়িই দোকানে ছিল। শ্রীনাথ কহিল—"হলাটার কি আক্কেল বল দেখি, পাঁচু! পূজোয় বসিচি, সেই সময় গিয়ে কি না…। আরে, আমি কি ভিন্-গাঁয়ের লোক, না—গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্চি। নোটখানা বালিসের তলায় রেখেছিলুম, আর খুঁজেই পেলুম না। কোথায় যে গেল; দশ-দশটা টাকা! কী লোকসানের বরাত দেখ্ দেখি। তার ওপর, হলা গিয়ে চীৎকার সুরু কোরে দিলে! পূজোটাই আজ ভাল ক'রে হ'ল না। ঝাড়া দু'টি ঘণ্টা যেখানে আমার পূজোয় লাগে, সেখানে…"

পাঁচকড়ি বেশ নম্রভাবে, মিষ্টি করিয়া কহিল—"হলার কথা ছেড়ে দাও, ছিনাথ ঠাকুর; ওর কি কিছু, তোমার গিয়ে সুদ্ধি-বুদ্ধি আছে! তা, নোটখানা এনেছ ত?"

"আনব কি ক'রে। খুঁজে কি আর পেলুম, যে আনবো। কাল একবার ভাল করে খুঁজবো। তোর কোন চিন্তা নেই, পাঁচু; না পেলে, লোকসান আমারই; তোর টাকা আর যাবে কোথা বল্। শ্রীনাথ রায় যদি

হঠাৎ ম'রেও যায়, তা হোলে ভূত হোয়েও তার পাওনা-দারদের সে…”

পাওনাদারদের সে ঘাড় মট্‌কাইবে, না—পাওনা শোধ করিয়া দিবে, সেটা ঠিক বুঝা গেল না; যেহেতু, বাকী কথাগুলা অস্পষ্টভাবে বলিতে বলিতে শ্রীনাথ ও-পাড়ার পথ ধরিয়া হন্-হন্ করিয়া চলিয়া গেল। ও-পাড়ার যুবকেরা শ্রীনাথের উৎসাহে মাসখানেক হইল থিয়েটারের ক্লাব বসাইয়াছিল। হরি-সভার পাশে যে খালি ঘরখানা পড়িয়াছিল, সেইখানে প্রত্যহ আখড়া বসে। শ্রীনাথ সেইখানে গেল।

পরদিন প্রভাতে দোকানে আসিবার সময় হলধর নোটের জন্য তাগাদা করিতে শ্রীনাথের বাড়ীতে আসিয়া শ্রীনাথের স্ত্রী উষাবতীর মুখে শুনিল যে, শ্রীনাথ রাত থাকিতে উঠিয়া পাঁচটা দশের ট্রেণে হুগলী গিয়াছে; সন্ধ্যার ট্রেণে বাড়ী ফিরিবে।

সন্ধ্যার ট্রেণে ষ্টেশনে নামিয়া শ্রীনাথ বরাবর ও-পাড়ার ক্লাবে গিয়া হাজির হইল, এবং সমবেত সকলের চিন্তা ও উদ্বেগপূর্ণ মুখ হইতে সংবাদ শুনিল যে, গতরাত্রে ক্লাবের হার্ম্মোনিয়মটি চুরি হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনাথ চমকাইয়া উত্তর করিল—“কি কোরে চুরি হ'ল ?”

"তালা ভেঙ্গে।"

শ্রীনাথের মুখে বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। হার্ম্মোনিয়ম কিনিবার টাকার জন্য তাহাকে যদিও কোনও চাঁদা দিতে হয় নাই বটে, কিন্তু আর সকলকেই ত চাঁদা দিতে হইয়াছে। পঁয়ষট্টি টাকার অমন সুন্দর হার্ম্মোনিয়মটা!···এখনো একটা মাসও হয় নাই···আহা-হা···!

পরদিন প্রভাতে শ্রীনাথ, নন্দীদের দোকানে আসিয়া হলধরকে কহিল—"নোটখানা খোয়াই গেল হলধর; অনেক খোজা-খুঁজি কোরেও আর পেলুম না!" সঙ্গে সঙ্গেই একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ট্যাঁক হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল, এবং তাহা হলধরের হাতে দিয়া কহিল—"লোকসানের বরাত, নইলে আর এমনটা হয়! এই দু'টো টাকা এখন নে হলা, বাকীটা দিয়ে দোবো এখন।"

হলধর গতকল্য পূজার ব্যাঘাত জন্মাইয়া অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং আজ আর কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য না করিয়া, হাত পাতিয়া টাকা দুইটি লইয়া নমস্কার করিল।

হার্ম্মোনিয়ম চুরি হওয়ার পর ও-পাড়ার ক্লাব উঠিয়া গিয়াছিল। সে-দিন সকালে সুরেন সরকারের বৈঠক-

খানায় শ্রীনাথ ও এ-পাড়ার যুবকগণের একটা বৈঠক বসিয়াছিল।

শ্রীনাথ কহিল—"ও-পাড়ার ওরা ক্লাবটা তুলে দিয়ে ভাল করলে না, আর একটা হার্ম্মোনিয়ম অল্প-স্বল্প দিয়ে কিনলেই ত হোত।"

প্যারী কহিল—"ওদের কথা ছেড়ে দাও, ছিনাত দা'। তা হোলে এস, আমাদের এ-পাড়াতেই থিয়েটার ক্লাব বসানো যা'ক। অতুল চাটুয্যের কাপড়ের দোকান-ঘর-খানা ত শুধু-শুধু পড়ে র'য়েছে, ওঁদের বোলে-কোয়ে ঐ ঘরখানাতেই…।"

এককড়ি কহিল—"বসাতে হয়, শীগগির বসাও বাবা। 'প্রফুল্ল' বই ধরা হ'বে, আমি যোগেশের পার্ট নোবো; দেখবি সব, ফাষ্ট্ক্লাশ প্লে কাকে বলে, হুঁ!"

কিঙ্কর কহিল—"ও-সব বই পাড়াগাঁর 'অডিয়েন্সে'র কাছে চলবে না; কেউ বুঝবে না। এখানে পৌরাণিক ধরতে হবে,—সীতার বনবাস, কি কর্ণার্জ্জুন, কি জনা, কি আর-কিছু।"

যাহা হউক, মোটের উপর স্থির হইল, অচিরেই অতুল চাটুয্যের কাপড়ের দোকান-ঘরে ক্লাব বসানো হইবে।

এবং হইলও তাই। অতুল চাটুয্যের মত লইয়া

এবং আবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম—কতক কিনিয়া এবং কতক যোগাড় করিয়া ক্লাব বসাইয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে-সঙ্গেই বিপুল উদ্যম এবং উৎসাহে ক্লাবের কাজ চলিতে লাগিল। বই সিলেক্‌সান্ হইয়া গেল; যাহাকে যে পার্ট দিবার তাহা দেওয়া হইল; হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে গানের মহলা চলিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ—

হঠাৎ এ-পাড়ায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার এপিডেমিক্ দেখা দিল এবং তাহার ফলে ক্লাবের মেম্বাররা অসুস্থ ও অনুপস্থিত হইতে লাগিল। এবং ঠিক এই সময়ে আরও একটা এপিডেমিক দেখা দিল। এ এপিডেমিক্—হার্ম্মোনিয়ম চুরি! অর্থাৎ এ-পাড়ার ক্লাবের হার্ম্মোনিয়মটিও হঠাৎ এক রাত্রে চুরি হইয়া গেল।

সন্তোষ কহিল—"এ নিশ্চয়ই বাইরেকার চোর নয়, এ চেনা-চোর; গাঁয়ের লোকেরই কাজ।"

শ্রীনাথ কহিল—"দাঁড়াও, চুরি করা এবার দেখাচ্চি। এ চোর ধোরবো, তবে আমার নাম—ছিনাথ রায়।"

প্যারী কহিল—"ফের সব পাঁচ টাকা কোরে চাঁদা দিয়ে আর একটা কেনা যাক্। কিন্তু এবার থেকে এক জন লোক ক্লাবে শোয়াবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হইল না। পাঁচ টাকা

করিয়া চাঁদাও উঠিল না, হার্মোনিয়মও কেনা হইল না। যত দিন যাইতে লাগিল, সকলের উৎসাহও কমিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে ও-পাড়ার ন্যায়, এ-পাড়ার ক্লাবেও গণেশ উল্টাইয়া, লালবাতি জ্বলিল।

সকালবেলা তোয়াজ করিয়া চা খাইতে খাইতে শ্রীনাথ স্ফূর্ত্তিযুক্ত মনে গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল; একটু গম্ভীর মুখে উষাবতী আসিয়া কহিল—"ভারি স্ফূর্ত্তি দেখছি যে! কিন্তু এই রকম হার্মোনিয়ম চুরির টাকায় কত দিন সংসার চলবে? যদি…"

"চুপ্—চুপ্; আস্তে বল। কি করব বল না, দু'বেলা দু'টি ভাত খেতে হ'বে ত?"

"তাই বোলে চুরি কোরে—

"আহা-হা! আস্তে কথা কও না! বলচি যে, কোনো দিকে কোনও উপায় না পেয়ে, তবেই ত তোমার গিয়ে…। তবে কথা হচ্চে যে, শীগ্‌গিরই আমি ব্যবস্থা একটা করচি। এ-রকম পেটের ভাবনা নিয়ে বারো মাস এ-ভাবে দিন কাটাতে পারবো না। হয় এস্পার—নয় ওস্পার। আসচে মাসেই সরবো এখান থেকে।"

কুঞ্চিত চোখের চাহনিতে উষা কহিল—"কোথায় সরবে?"

"কোলকাতায়।"

শ্রীনাথ সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছে। শ্যাম-বাজারের এক বস্তীতে পাঁচ টাকায় একখানা টীনের ঘর ভাড়া লইয়াছে। দেশ থেকে আসিবার সময় তাহার হাতে গোটা ত্রিশ-চল্লিশ টাকা ছিল। তাহাতেই কোন প্রকারে এ-কয়দিন চলিয়াছে এবং আরও কয়েকটা দিন চলিবে।

দুপুর বেলা একটু দিবা-নিদ্রার পর শ্রীনাথ গলির দিক্‌কার জানালার ধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। সামনে, গলির ও-পারে ঘরখানায় এক জন অনুচ্চ কণ্ঠে গান গাহিতেছিল, আর একজন বাঁয়া-তবলায় মৃদু সঙ্গত করিতেছিল। শ্রীনাথ একটু উচ্চকণ্ঠে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"হোচ্চে না, কালীবাবু; একতালায় মিলবে না, কার্‌ফা বাজাতে হবে।"

মেদিনীপুরের দুইটি যুবক ওই ঘরে থাকিত। কোন একটা কাপড়ের দোকানে উহারা কাজ করিত। কোন দিন সকালে যাইয়া বেলা দুইটায় বাসায় আসিত, কোন দিন দুইটায় বাহির হইয়া রাত দশটায় আসিত। নিজেরাই পালা করিয়া রাঁধিত, এবং এক বেলার রান্নায় দুই বেলা চালাইয়া লইত।

কালীবাবু কারফা বাজাইতে লাগিল ; কিন্তু শ্রীনাথের তাহা মনঃপুত না হওয়ায়, সে উঠিয়া কালীবাবুদের ঘরে গিয়া হাজির হইল, এবং বায়া-তবলাটা নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বাজাইতে সুরু করিল। কালীবাবু কহিল —"আপনার হাতটা ত সুন্দর।"

শ্রীনাথ বাজনা বন্ধ করিয়া বলিল—"খাসা। যাই হোক, আপনারা আছেন বেশ দু'টিতে। বিদেশে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকতে হোলে এরকম একটু-আধটু আনন্দ নিয়ে না কাটালে চলে না।—আচ্ছা, কালীবাবু, একটা হার্ম্মোনিয়ম্ কেনেন না কেন ? সুরের সঙ্গে বেশ সুন্দর সঙ্গত চলে তা' হোলে।"

এই সময়ে একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে দরজার বাহির হইতে বলিল—"মা বল্লে, এই নাকছাবিটা রেখে আট আনা কি চার আনা দিতে পারেন ?"

কালীবাবু বলিল—"আজ আমাদের হাত একেবারে খালি ; বলগে। তোমার বাবা আজ কেমন আছেন ?"

মেয়েটি ছল্ ছল্ দৃষ্টিতে কহিল—"বাবার আজ আর জ্বর হয়নি।" বলিয়া একপা-একপা করিয়া সে চলিয়া গেল।

শ্রীনাথ কালীবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি কালীবাবু ?"

কালীবাবু কহিল—"এরা ওদিক্‌কার একখানা ঘর নিয়ে আছে। স্বামী, স্ত্রী আর ঐ মেয়েটি। একটি বছর তিনেকের ছেলে ছিল। সেটি আজ মাস-দুই হোল মারা গিয়েচে। ভদ্রলোকের কাজ-কম্ম নেই, কিছু উপায়-সুপায় নেই।

শ্রীনাথ কহিল—"কোলকাতা সহরে তা হোলে ত বড় বিপদে পড়তে হোয়েচে!"

"বিপদ বোলে বিপদ! ভাল থাকতে, তবু রোজ কোথাও বেরিয়ে দু'চার আনা নিয়ে আসতো—তাইতে কোন রকমে কষ্টে-সৃষ্টে চল্‌ছিলো। কিন্তু আজ দিন-পনের অসুখে পোড়ে, কষ্টের আর সীমা-পরিসীমা নেই। দু'-একদিন আমরা কিছু-কিছু সাহায্য কোরেছিলুম, কিন্তু আমরাও ত ভিকিরীর সামিল। বোধ হয়, কাল থেকে ওদের হাঁড়ী চাপেনি।"

"বলেন কি? অভুক্ত!—মেয়েটি?"

"খুকীকে আমি একটা পয়সা দিয়েছিলুম; তাই দিয়ে একটু আগে ও মুড়ী কিনে খেয়েচে। ভদ্রলোক আজ পনর দিন বিনা চিকিৎসায়—"

কালীবাবুর শেষ কথা গুলি শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া শ্রীনাথ তাহার নিজের ঘরে চলিয়া গেল এবং মিনিট পনরর মধ্যে কিছু চাল, দাল, তেল, নুণ, তরকারী

এবং পাঁচ টাকার একখানা নোট আনিয়া কালীবাবুর হাতে দিয়া কহিল—"ভদ্রলোকের ঘরে দিয়ে আসুন, কালীবাবু। আমার নাম করবেন না। মেয়েটির মাকে শীগ্‌গীর উনান্ ধরাতে বলুন।"

কালীবাবু কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল; কহিল—"ওদের ভারী উপকারটা করলেন আপনি। ওরা আপনাদেরই ব্রাহ্মণ; সুতরাং এ অবস্থায় ব্রাহ্মণকে—"

বাধা দিয়া শ্রীনাথ কহিল—"অভুক্ত; অন্নহীন; বিনাচিকিৎসা; কচি মেয়ের ছল্ ছল্ চোখ!—এখানে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নেই কালীবাবু! যান্, আপনি এগুলো দিয়ে আসুন আগে।"

জিনিষগুলি ও নোটখানা হাতে লইয়া কালীবাবু খুকীদের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

"আপনি সেদিনকার অতি-বড় দুর্দ্দিনে আমাদের যে "কী সাহায্য করেচেন, তা আর কি বোলবো! এ পুণ্য আপনার—"

"বিজয়বাবু, পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম বিচারজ্ঞান কিছুই আমার নেই, কিছুই ও-সব বুঝিও না। তবে এইটুকু বুঝি যে, জীব হোয়ে যখন জন্মগ্রহণ করতে হোয়েচে, তখন সেই জীবনধারণের জন্যে একমুঠো ডাল-ভাত

আমায় পেতেই হ'বে। শুধু দু'টি ডাল-ভাত। তার বদলে আমার যা-কিছু সামর্থ্য, যা-কিছু শক্তি, তা আমি দিতে প্রস্তুত। ক্ষীর-সর, ঘি-মাখন, পোলাও-কাবাবও চাই না, মোটর-জুড়ীও চাই না। চাই দু'টি অতি-সাধারণ অন্ন, তা যেমন-কোরেই হোক।"

এক দিন বিকালে শ্রীনাথের ঘরে বসিয়া শ্রীনাথ ও খুকীর বাবার মধ্যে ঐরূপ কথা হইতেছিল।

"আচ্ছা বিজয়বাবু, সে চাকরী আপনার গেল কেন?"

"রিডাক্‌সানে।"

"তার পর থেকেই বরাবর বেকার ত?"

"না। এক জন 'ম্যাজিসিয়ানে'র কাছে বছর-তিনেক কাজ কোরেছিলুম।"

"ম্যাজিসিয়ানের কাছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার 'ভেন্‌ট্রিলোকুজিম্' জানা ছিল, তাই—

বাধা দিয়া শ্রীনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"ওটা কি ব্যাপার?"

"মুখ বুজিয়ে বা যৎসামান্য খুলে, কণ্ঠ থেকে একটা অদ্ভুতভাবে কথা কোয়ে যাওয়া। মনে হ'বে, যেন অনেকটা দূর থেকে কে এক জন কথা কইচে। ম্যাজিসিয়ানরা এই 'ভেন্‌ট্রিলোকুইজিমে'র সাহায্যেই

দর্শকদের ধাঁধা লাগিয়ে দেয় যে, তারা যেন প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা কইচে।"

"ঠিক ঠিক; শুনিচি বটে। বর্দ্ধমানে এক জায়গায় ম্যাজিক দেখেছিলুম। লোকটা আকাশের দিকে চেয়ে ভূতকে ডাকলে আর ভূত অনেক দূর থেকে 'যাচ্চি, যাচ্চি' বলতে বলতে এলো আর কথা কইতে লাগলো। যাক্, ব্যাপারটা এইবার বোঝা গেল। ওটা বুঝি আপনার অভ্যাস আছে। আচ্ছা, একটুখানি করুন ত, দেখি।"

বিজয়বাবু তখন একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া গলাটাকে একটু সানাইয়া লইল। তাহার পর মুখখানাকে অল্প একটু ফিরাইয়া লইয়া কণ্ঠমধ্য হইতে অপূর্ব্ব কৌশলে কথা বাহির করিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইল, যেন কোন লোক অনেকটা দূর হইতে কথা কহিতেছে। সেই স্বর ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। অবশেষে মনে হইল, সেই ঘরেরই একটা কোণ হইতে কে যেন কথা কহিতেছে।

খানিক পরেই বিজয়বাবু চলিয়া গেল। শ্রীনাথ সেইখানেই তেমনিভাবে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। ঊষা কহিল—"কি গো, চুপ্-চাপ্ এতক্ষণ ধোরে বোসে আছ যে?"

শ্রীনাথ নিরুত্তর।

"বলি, হোল কি তোমার ? ভাব লাগ্‌লো না কি ?"

এইবার শ্রীনাথ নড়িয়া উঠিল ; কহিল—"গভীর !"

"কিসের ভাব ?"

"প্রেমের।"

"কা'র সঙ্গে ?"

"টাকা, পয়সা, নোট, মোহর……"

"তা হোলে ভাব নয়কো, স্বপ্ন বল।"

"স্বপ্ন যা'তে সত্য হয়, তা'রির ভাবনাই ভাবছি উষা ; দেখা যা'ক, কদ্দুর কি কোরতে পারি।" বলিয়া শ্রীনাথ উঠিয়া পড়িল, এবং ভাব-ই হউক আর ভাবনা-ই হউক—তাহারই মধ্যে ডুবিয়া ঘরের ভিতর ধীরপদে পায়চারী করিতে লাগিল।

পরদিন সকাল বেলা শ্রীনাথ বিজয়বাবুকে ডাকিয়া আনিল এবং প্রায় ঘণ্টা-তুই ধরিয়া উভয়ে কোন-একটা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবার পর, শ্রীনাথ উৎসাহের সহিত কহিল—"টাকার বন্যা আমাদের ঘরে বইবে, বিজয়বাবু ! তু'টি পেটের ভাতের জন্যে আর এমন কোরে দগ্ধে মরতে হবে না। তবে, শ'-খানেক টাকার যোগাড় না করলে, কাজে বসা যাবে না। দেখা যাক, কোত্থেকে যোগাড় হয়।"

বিজয়বাবু উঠিয়া গেলে, উষা রান্নাঘর হইতে এ-ঘরে আসিয়া কহিল—"দেখ, এ-বেলাটা কোন রকমে হোলো, কিন্তু ও-বেলার জন্যে আর চা'ল নেই, ডাল নেই, তেল নেই ; মশলাও সব আনতে হবে,—কিছুই নেই।"

শ্রীনাথ কহিল—"উষা, দুঃখের এই নিশাকে ঠেলে দিয়ে, শীগ্‌গিরই বোধ হয় এমন সুখের উষা এনে ফেলবো, যে-দিন তোমায় বলতে হবে যে, চা'ল, ডাল, তেল, ঘি, মাখন—রাখবার আর জায়গা নেই !"

উষা মৃদু হাসির সহিত কহিল—"কোনও হার্ম্মো-নিয়মের আড়তের বাবুর সঙ্গে ভাব্-সাব্ হোয়েছে না কি ?"

শ্রীনাথ আর কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্বদিনের মত ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল।

উষা কহিল—"বাড়ী-ওলার বৌয়ের অসুখের না কি বাড়াবাড়ি অবস্থা !"

"কে বল্‌লে ?"

"ঐ ও-ঘরের ওরা বলছিলো। একবারটি আজ গিয়ে খবরটা নিয়ে এসো।"

এই সময়ে বাড়ী-ওয়ালার এক জন লোক শ্রীনাথের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—"রায় মশাই আছেন কি ?"

শ্রীনাথ বাহিরে আসিতেই লোকটি কহিল—"গামচাটা কাঁধে ফেলে চলুন একবার। ছোট গিন্নী ত······।" —লোকটী মুখ-চোখ ও হাতের একটা ভঙ্গী করিল।

শ্রীনাথ বিস্ময়ের ভাবে কহিল—"কখন ?"

"এই আধ-ঘণ্টা আন্দাজ। কর্ত্তা ত পাগলের মত হোয়েছেন। আসুন শীগ্‌গির; ব্রাহ্মণ চার জন ত চাই-ই। তিন জন হোল; দেখি, আর এক জন কা'কে পাই। আপনি আর দেরী করবেন না! শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়ুন।"

লোকটি চলিয়া গেল।

শ্রীনাথ তখনি গামচাখানা কোমরে বাঁধিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীওয়ালা মন্মথ চক্রবর্ত্তী বহুকাল আগে বাঁকুড়া জেলা হইতে কলিকাতায় আসিয়া ১২৲ টাকা মাহিনায় বেলেঘাটার কোন আড়তে কয়াল-গিরি করিতে করিতে, লক্ষ্মীর কৃপায় বেশ-দু'পয়সার সংস্থান করেন। লেখা-পড়ার জ্ঞান কিছু না থাকিলেও, সুতরাং তখন বেশ পণ্ডিত এবং মান্য-গণ্য হইয়া উঠিলেন। এই স্ত্রীটি তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিল। পর-পর প্রথম দুই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, ৪৮ বৎসর বয়সে চৌদ্দ বৎসরের এই মেয়েটিকে তিনি পুনরায় কোথা হইতে বিবাহ করিয়া

আনেন। দশ বৎসর ধরিয়া মন্মথের ঘর করিবার পর আজ সেই স্ত্রীও মন খালি করিয়া, প্রাণে শেলাঘাত করিয়া পরলোকে চলিয়া গেল।

এই অল্প দিন তাঁহার টীনের বাড়ীর ভাড়াটীয়ারূপে থাকিয়াই শ্রীনাথ তাঁহার সহিত খুব আলাপ জমাইয়া লইয়াছিল।

শ্রীনাথ ও-বাড়ীতে গিয়া দেখিল, মন্মথ সত্যই পাগলের মত হইয়াছেন। শ্রীনাথ শাস্ত্র ও নীতি-কথা আওড়াইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে সুরু করিল।

মৃতদেহ যখন বাঁধা হয়, তখন কে এক জন বলিল—"গলার হারছড়াটা খুলে নাও, ওটা আর ঐ সঙ্গে বৃথা..."

দুঃখমিশ্রিত একটা ধমকের ভঙ্গীতে শ্রীনাথ কহিল—"সবই ত বৃথা! যে সোণার প্রতিমা আজ মন্মথবাবুর গলা থেকে খসে গেল, সে-গলা থেকে কি ঐ তুচ্ছ হার ছিনিয়ে নিতে আছে! ও ওঁরই সঙ্গে যা'ক।"—বলিয়া শ্রীনাথ খাটের সঙ্গে মৃতদেহ বাঁধিয়া ফেলিল।

মন্মথ বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে কহিলেন—"ছিনাথবাবু খাঁটি কথা বোলেছেন। সোণার প্রতিমা—সোণার প্রতিমা! বুক ধ্বসিয়ে দিয়ে গেল! উঃ!"—শ্রীনাথেরও চোখে জল আসিল; আর কথা কহিতে পারিল না।

মৃতদেহ সংকার করিয়া সন্ধ্যার পর ভিজা কাপড়ে শ্রীনাথ যখন ঘরে আসিল, উষা জিজ্ঞাসা করিল—"হোয়ে গেল! আহা, বৌটা…"

"বেঁচে গেল!—বেঁচে গেল! বৌটা বেঁচে গেল, উষা—ধর ত এইটে, ভিজে কাপড়টা ছাড়ি।"—বলিয়া শ্রীনাথ ট্যাকের পাক খুলিয়া কি একটা দ্রব্য উষার হাতে দিল। উষা চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিল—"এ কি! সোণার হার কোত্থেকে…?"

"চুপ্—চুপ্!…উঃ! বড্ড ভাবছিলুম শ'খানেক টাকার জন্যে! ভরি তিন-চার হবে বোধ হয়,—না?"

উষা বিস্মিত হইয়া শ্রীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে কালীঘাটের 'সেনাট্-রয়' সম্বন্ধে খুব একটা হৈ-চৈ লাগিয়া গিয়াছে। যেখানে-সেখানে সকলের মুখে 'সেনাট্-রয়' লইয়া আলোচনা—আন্দোলন চলিতেছে।

বৌবাজারের 'বিশ্ব-বার্ত্তা' খবরের কাগজের অফিসে সে-দিন বাবুদের মধ্যে 'সেনাট্-রয়' সম্বন্ধে জোর আলোচনা চলিতেছিল। সুরেশবাবু কহিলেন—"অদ্ভুত ব্যাপার। এ আর তোমাদের জ্যোতিষ-ফোতিষ, হস্তরেখা, সামুদ্রিক

—ও-সব কিছু নয়। এ হোলো খাঁটি 'স্পিরিট্'-এর ব্যাপার। 'স্পিরিটে'র মুখ দিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ বোলে দিচ্চে।"

কালিপদ কহিল—"অনেক সময় 'স্পিরিট্' আসতে রাজি হয় না ; শেষকালে ওঁর খুব ধমকে খেয়ে, 'যাচ্চি-যাচ্চি' বলতে বলতে অনেক দূর থেকে ছুটে আসে।"

নিতাই বাবু কহিলেন—"লোকও হোচ্চে খুব। বাঙালী আর মাড়োয়ারী বেশী, তা ছাড়া পাঞ্জাবী আছে, মাদ্রাজী আছে, উড়িয়া আছে, বেহারী আছে। যদি ধর গিয়ে…"

বাধা দিয়া রামবাবু কহিলেন—"আরে হ'বে না কেন ? ভূতের মুখ দিয়ে সব বার করাচ্চে ত ! বাহাদুরী আছে। ভূতকে এ-ভাবে পোষ মানানো, এ বড় সোজা কথা নয় !"

ভূতনাথ কহিল—"সে-দিন আমাদের পাড়ায় দীনুবাবুর সঙ্গে আমি গিয়েছিলুম। তাঁকে স্পিরিট্ খুব এক চোট ধমক দিয়ে বোলে দিল—'চোলে যাও, আফিং না ছাড়লে, রোগও তোমায় ছাড়বে না'।"

ও-ঘরে বসিয়া নরেণবাবু কাজ করিতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না ; এ-ঘরে আসিয়া কহিলেন —"ওর সব ব্যাপার আমি জানি। ঐ লোকটির নাম—

শ্রীনাথ রায়। তাই থেকে ওঁর আফিসের নাম 'সেনাট্-রয়' হোয়েচে। নর্ম্মদা পাহাড়ে ভুল্লু-বাবা নামে ওঁর এক সিদ্ধ গুরু থাকতেন। আড়াই-শো বছর বয়সে তিনি দেহ-রক্ষা করেন। উনি তখন সেইখানেই ছিলেন ;—"

ভূতনাথ চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিল—"আড়াই-শো ব-চ্ছ-র!"

"হ্যাঁ, চুপ কর। তার পর তাঁর মৃতদেহ যখন দাহ করা হয়, তখন তাঁর একখণ্ড হাড় উনি লুকিয়ে ফেলেন। সেইটা নিয়ে উনি পালিয়ে আসেন। এখন সেই হাড়টুকুর জন্যে ভুল্লু-বাবার মুক্তি হোচ্চে না। ঐটুকু ফিরে পাবার জন্যে ভুল্লু-বাবার প্রেতাত্মা দিনরাত ওঁর পেছন-পেছন ঘুরচে; আর তাকে দিয়ে উনি সকলের সব প্রশ্নের জবাব বা'র কোরে নিচ্চেন। আরো কত-কি সব কোরে নিচ্চেন।"

নিতাইবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"কাজ সব হচ্চে অদ্ভূত! আমাদের 'বেহারীদা'র সঙ্গে বৌদি'র ছিল—আদায়-কাঁচকলায়। কিন্তু——"

হঠাৎ এই সময় বড় বাবু আসিয়া পড়ায় আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

যখন এখানে আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল, তখন কালীঘাটে, 'সেনাট্-রয়'-এর নীচের বড় ঘরখানার মধ্যে

বহু লোক সমাগম। দ্বিতলের ঘরখানির একধারে পুরু তোষকের উপর কার্পেট পাতা। তাহার উপর বসিয়া—শ্রীনাথ ; সম্মুখে একটু দূরে চেয়ারে বসিয়া—একটি বাবু। এক কোণের দিকে সতরঞ্চ পাতা, তাহার উপর বিজয়বাবু বসিয়া, খাতাপত্র-হিসাব প্রভৃতি লইয়া লেখা-পড়ায় ব্যস্ত।

শ্রীনাথ বাবুটির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি ; ফিল্ম্-য্যাক্ট্রেস্ ঐ 'ছায়া'র পেছন-পেছন আপনি ছায়ার মত ঘুরচেন, কিন্তু তার মনের ভাব-গতিক কিছু বুঝতে পারছেন না। সে আপনাকে চায় কি না, সেইটা জানতে চান। আচ্ছা, জানিয়ে দিচ্চি।—ভুল্লু বাবা! ভুল্লু বাবা!"

অনেক দূর হইতে সাড়া আসিল—"যাচ্চি, যাচ্চি।"

স্বর ক্রমে কাছে আসিল। কহিল—"কি বোলবে বল।"

শ্রীনাথ বিনীতভাবে বলিল—"এঁর খবরটা দয়া ক'রে বোলে দিন।"

"হবে না, হবে না। ছায়া ওকে ছ'চক্ষে দেখতে পারে না। ঐ যে আর একটা লম্বা-চুলো লোক আছে, ছায়া তাকেই ভালবাসে। এর মুখে এইবার একদিন লাথি মারবে।"

বাবুটি পাগলের মত হইয়া গেল ; কহিল—"উঃ!

তা হোলে আমি মারা পড়বো ; বিষ খাবো ; লেকের জলে —নাঃ, লেকের জলে লোকে ডুবে-ডুবে জল ঘোলা কোরে ফেলেচে—লালদীঘির জলে গিয়ে ডুববো ! ছায়াকে যাতে পাই, তা আপনাকে কোরে দিতেই হবে।"

শ্রীনাথ কহিল—"তা, সে হবে। কিন্তু সে কাজ ত আলাদা। এ 'ফী'তে ত তা হবে না। তার জন্যে বেশী ফী লাগবে। ভুল্লু বাবাকে ভাল রকম সন্তুষ্ট কোরে তবে…। অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা…"

অত্যন্ত অধীর হইয়া বাবুটি পাঁচিশটা টাকা শ্রীনাথের পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল—"এইতেই দয়া করতে হবে। ছায়ার পেছনে আমার সব গেছে, আর আমার বেশী কিছু নেই।"

"আচ্ছা ; হবে। সাত দিন পরে আসবেন।" বলিয়া বাবুটিকে বিদায় দিয়া শ্রীনাথ নীচে হইতে এক মাড়োয়ারীকে ডাকাইল। ভিঙ্গারমল্ আসিয়া শ্রীনাথকে নমস্কার জানাইয়া কহিল—"ভুল্লু বাবাকো বাত্ একদম্ ঠিক্-সে-ঠিক্ হোইয়ে গেলো বাবুসাব ! বেলকুল্, ঘিউ উও কন্‌টাকটারসাব্ লিয়া লইলো।"—অতঃপর গলার স্বর একটু নামাইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল—"বেল্‌কুল্ চর্ব্বি অউর ভোজ্জিটব্‌ল্ থা ; তেয়াল্লিস্‌মে বিক্ গেলো।"

"আচ্ছা হইলো। আজ কেয়া কাম্ হায়, বোলিয়ে।"

একখানি দশ টাকার নোট শ্রীনাথের হাতে দিয়া ভিঙ্গারমল্ কহিল—"সোনেকা ভাও, বাবুসাব। এ মাহিনামে তেজি রহে গা, কি জেরাসে কোম্‌তি হোবে?"

শ্রীনাথ ডাকিল—"ভুল্লু বাবা! ভুল্লু বাবা!"

বাহিরের আকাশের এক কোণ হইতে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'ত্রাহি মাং দেবদেবেশত্বত্তো নান্যোঽস্তি রক্ষিতা।
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে যৌবনে যচ্চ বার্দ্ধক্যে,
তৎপুণ্যং বৃদ্ধিমাপ্নোতু……"

স্বর ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। বুঝা গেল, ভুল্লু বাবা আসিতেছেন।

অবশেষে ভুল্লু-বাবা ঘরের মধ্যে আসিলেন। কড়ি-কাঠের কাছ থেকে তিনি কহিলেন—"কি জিজ্ঞাসা করবে?"

যাহা জিজ্ঞাসা করিবার, জিজ্ঞাসা করা হইল। ভুল্লু-বাবা উত্তর দান করিয়া—'ত্রাহি মাং' ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে আবার বহু দূরে চলিয়া গেলেন।

তার পর নীচে হইতে যাহাকে ডাকা হইল, তিনি যুবক; খদ্দরের পোষাক-পরিহিত। তিনি 'ফী' জমা দিয়া প্রশ্ন করিলেন। তিনি কয়েক জনের নাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এঁরা সকলেই কি খাঁটি দেশ-সেবক,

না, এর ভেতরে ভেজাল আছে? আমার সন্দেহ হোয়েচে যে, এঁদের ভেতর জনকতক দেশ-সেবার নামে দেশের ও দশের উপর অত্যাচার কচ্চেন। এঁরা নিজেদের সামান্য স্বার্থের জন্য, আমার মনে হয়, যত-কিছু অপকর্ম্ম—সবই করতে পারেন এবং করেন। এই সন্দেহটা আমার ভঞ্জন কোরতে হবে।"

এই সময় বিজয়বাবু লেখা বন্ধ করিয়া বাহিরের বারান্দায় উঠিয়া গেল। শ্রীনাথ ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বাবুটিকে কহিল—"আপনার প্রশ্নের উত্তর কাল পাবেন। আজকে ভুল্লু-বাবার অনেকটা পরিশ্রম হোয়েচে, আজকে আর তাঁরে খাটাবো না।"

'ফী'য়ের রসিদখানি হাতে লইয়া বাবুটি সে-দিন চলিয়া গেলেন।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

এই এক বৎসর কাল 'সেনাট্-রয়'-এর কাজ খুব জোরে চলিয়া বর্ত্তমানে দিন পাঁচ-সাত বন্ধ আছে। বন্ধ থাকিবার কারণ—শ্রীনাথ রায়ের অসুস্থতা। আসলে কিন্তু শ্রীনাথ অসুস্থ নহে। অসুস্থ—বিজয়বাবু। বিজয়-বাবুর এক বৎসরকাল সমানে 'ভেন্‌ট্রিলোকুইজিম্' করার ফলে গলার মধ্যে একটা অসুস্থতা বোধ করিতেছেন।

ডাক্তার কণ্ঠ পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন ও কথা কহিতে একেবারেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীনাথ কহিল "বিজয়বাবু, 'সেনাট্-রয়' একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়ে কাগজে-কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক্।"

"কি বিজ্ঞাপন দেবেন ?"

"বিজ্ঞাপন দেবো এই বোলে যে, ভুল্লু-বাবার হাড় ভুল্লু-বাবার প্রেতাত্মাকে ফেরত দেওয়া হোয়েচে, সেহেতু আর অধিক কাল এভাবে তাঁকে আটক রাখা ও খাটান ন্যায়-ধর্ম্মবিরুদ্ধ।"

তাহাই হইল। 'সেনাট্-রয়'-এর সাইনবোর্ডখানা খুলিয়া লইয়া আফিস্ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। শ্রীনাথ কহিল—"বিজয়বাবু, আর চালানও উচিত হ'ত না। কেন না, এই এক বছরে আমাদের সংসার-খরচ চালিয়ে, আর আমাদের মত গরীব-দুঃখীদের কিছু কিছু সাহায্য কোরেও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা জমে গেছে। আমাদের বাকী জীবনের জন্যে এই যথেষ্ট। আপনি পনর-হাজার নিয়ে দেশে যান, আর আমিও পনর-হাজার নিয়ে দেশে যাই।"

এই সময় এক দিন ভৃত্য ভজহরি আসিয়া খবর দিল যে, এক জন লোক তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে চায়।

লোকটা নাছোড়বান্দা। সে একবার দেখা না করিয়া কিছুতেই যাইবে না। শ্রীনাথ তাহাকে আনিতে বলিল।

একখানা মলিন, ছিন্ন কাপড়-পরা, গায়ে একটি তালি দেওয়া হাফ-সার্ট, পায়ে একটি কর্দ্দমাক্ত স্যাণ্ডেল, চেহারা শুষ্ক-শীর্ণ, মাথায় বিরল রুক্ষ কেশ—একটি ভদ্রলোক অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"আপনারা বন্ধ কোরে দিয়েছেন জানি, কিন্তু আমার একটি প্রশ্নের উত্তর আজ দিতেই হবে। এ দয়া করতেই হবে, নইলে আমি আত্মহত্যা করবো। দু'একখানা থালা-বাসন ছিল পুঁজি, আজ তাই বিক্রী কোরে আপনার ফী-এর টাকা এনেছি। কিন্তু তাও পাঁচ টাকা; তার বেশী আর হোলো না।"

শ্রীনাথ লোকটির আপাদমস্তক ভাল করিয়া বার বার দেখিয়া কহিল,—"আপনার কি প্রশ্ন?"

"প্রশ্ন আমার এই যে, গুষ্টিশুদ্ধু খেতে পাচ্চি না। অনাহারে বড়-লোকের দোরে হেঁটে-হেঁটে পায়ের নড়া ছিঁড়ে ফেলেছি, গালাগালি দিয়ে তারা সব তাড়িয়ে দেয়। উদয়াস্ত ঘুরে ঘুরে একমুঠো অন্নের জোগাড় কোরতে পারি না। সকলে ক্ষিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছে। আঠার আনা খেটে দু'আনার পারিশ্রমিকও যদি পাই, তাই যথেষ্ট ব'লে মনে করি, কিন্তু তা-ও পাই না। তাই

জানতে চাই, এ পেটের জ্বলুনি আমাদের থামবে, কি থামবে না। যদি জানতে পারি, থামবে না, তা' হোলে বিষ খেয়ে ম'রবার ব্যবস্থা করবো। দয়া কোরে এইটে আমায় শুধু জানিয়ে দিন।"

শ্রীনাথের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি বলুন তো?"

"ভবানী বিশ্বাস।"

"ও! আপনিই ভবানী বিশ্বাস? আপনার প্রশ্নের উত্তর ভুল্লু-বাবা আগেই দিয়ে চলে গেছেন। ক্ষিদের জ্বালা আপনাদের শীগ্‌গিরই ঘুচবে। একটু বসুন, আমি আসচি।" বলিয়া শ্রীনাথ বাহির হইয়া গেল, এবং মিনিট-দশেক পরে পুনরায় আসিয়া ভবানী বিশ্বাসের হাতে একতাড়া নোট দিয়া কহিল—"ভুল্লু-বাবা এই একশো টাকা আপনাকে দিয়ে গেছেন।"

ভবানী বিশ্বাস কাঠের পুতুলের ন্যায় শ্রীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রীনাথ দেশে আসিয়াছে।

কলিকাতায় থাকা-কালে তাহার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। এই মাসেই তাহার 'অন্নপ্রাশন' হইবে।

সে-দিন খোকাকে বুকে করিয়া পাইচারী করিতে করিতে শ্রীনাথ উষাকে কহিল—"উষা, চাল, দাল, তেল, ঘি, মাখন—রাখবার জায়গা হ'চ্ছে ত ?"

অনেক দিনের পুরাণো কথা উষার আজ মনে পড়িয়া গেল। উত্তর দিবার কিছুই ছিল না ; মুখ টিপিয়া উষা শুধু একটু হাসিল ; তাহার পর কহিল—"খোকার 'ভাতে' কিন্তু গাঁয়ের ক'ঘর ব্রাহ্মণ-বাড়ী 'সামাজিক' বিলোতে হবে।"

খোকাকে ধরিয়া দুই হাতে নাচাইতে নাচাইতে শ্রীনাথ কহিল—"কি 'সামাজিক' দিতে চাও, বল।"

"একখানা কোরে কাঁসার বড় থালা, আর সেই থালা-ভরা সন্দেশ।"

"এ আর বেশী কথা কি ? গোটা চার-পাঁচ থিয়েটারের আখড়ায় যাতায়াত আরম্ভ কোরলেই হোয়ে যাবে।"

এ-গাঁয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া লইয়া ঘর-তিরিশেক ব্রাহ্মণের বাস। কলিকাতা হইতে শ্রীনাথ খুব বড় বড় উৎকৃষ্ট খাগড়াই কাঁসার ত্রিশখানা থালা আনাইল। সেই সঙ্গে আর একটা জিনিষ ত্রিশটি আসিল। তারপর অন্ন-প্রাশনের দিন যখন সেই থালা ভরিয়া এক-থালা করিয়া সন্দেশ ও একটা করিয়া সেই দ্রব্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণবাড়ী

পাঠানো হইল, তখন এক দিকে যেমন সকলে আনন্দিত হইল, সেই সঙ্গে কিছু বিস্মিতও হইল। বৈকালের দিকে গাঁয়ের কয়েকজন আসিয়া শ্রীনাথের সহিত দেখা করিয়া কহিল—"বড় আনন্দের কথা শ্রীনাথ। ভগবান তোমাকে আরও সুখে রাখুন; খোকাকে দীর্ঘজীবি করুন। কিন্তু একটা ব্যাপার আমরা কেউ কিছু বুঝতে পাচ্চি-নে।"

"ঐ একটা কোরে হার্ম্মোনিয়ম দিয়েছি, ঐ কথা ত? কথাটা হোচ্চে এই যে, আমি গাঁ থেকে চলে যা'বার আগে, গাঁয়ের ভেতর দু'দুটা হার্ম্মোনিয়ম চুরি গেল। নিশ্চয়ই গাঁয়ের লোকই নিয়েছিল। আর পেটের জ্বালাতেই বোধ হয় সে এ-কাজ কোরেছিলো। সুতরাং এ-চুরিতে আমার মনে হয়, তার পাপ হয়নি; কিন্তু বলিতে পারি না, যদি পাপ হোয়েই থাকে, তা'হলে তা'র হোয়ে আজ আমিই সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরলুম। কেন না, সে যে-ই হোক, সে আমারই গাঁয়ের একজন ত বটে।"

সকলের এক দিকের বিস্ময় যেমন কমিল, অপর দিকে তেমনি আবার নূতন করিয়া বিস্ময় জমিয়া উঠিল।

শ্রীনাথ কহিল—"ভগবান যখন এত দিনে আমায় দয়া কোরেচেন, তখন·········। আর ওতে আমার এমন কিছু বেশী খরচও যে হোয়েচে, তা'ও নয়।"

"তিরিশটাতে কত ব্যয় পড়লো?"

"পাইকারী দামে পেয়েছি কি না; হাজারখানেকেই হোয়েচে।"

কিছুক্ষণের জন্য অবাক হইয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীনাথের মুখের দিকে সকলে তাকাইয়া রহিল।

সমাপ্ত